প্রকৃতি পরিচয়

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

প্রকৃতি-পরিচয়

(ভূগোল ও বিজ্ঞান)

দ্বিতীয় ভাগ

(চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য)

সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
রাইটার্স বিল্ডিংস্
কলিকাতা ১

সংশোধিত সংস্করণ
ডিসেম্বর ১৯৬৬
পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮
পুনর্মুদ্রণ নভেম্বর ১৯৬৯
পুনর্মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৭২
পুনর্মুদ্রণ অক্টোবর ১৯৭৩
মূল্য : চল্লিশ পয়সা

মুদ্রক :
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড
৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

নিবেদন

অল্পমূল্যে সহজবোধ পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশনের সরকারী পরিকল্পনা অনুযায়ী কয়েক বৎসর পূর্বে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর জন্য ভূগোল ও বিজ্ঞানের পাঠক্রম অনুসারে "প্রকৃতি পরিচয়" প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল।

এই পুস্তকে ভূগোল ও বিজ্ঞানের মূল তথ্যগুলি শিশুমনের উপযোগী করে ধারাবন্ধভাবে পরিবেশন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। কোনো অনিবার্য ভুলত্রুটির সংশোধন অথবা বইটির উন্নতি-কল্পে শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ্‌গণের অভিমত বইটির পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশের সময় যথাযথ বিবেচিত হবে।

যাঁরা এই পুস্তক রচনা, প্রণয়ন ও প্রকাশনে সাহায্য করেছেন শিক্ষা-অধিকারের পক্ষ থেকে তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

রাইটার্স বিল্ডিংস,
কলিকাতা
২০ অক্টোবর ১৯৭৩

শ্রীনিশীথরঞ্জন কর
শিক্ষা-অধিকর্তা,
পশ্চিমবঙ্গ

সূচীপত্র

ভূগোল

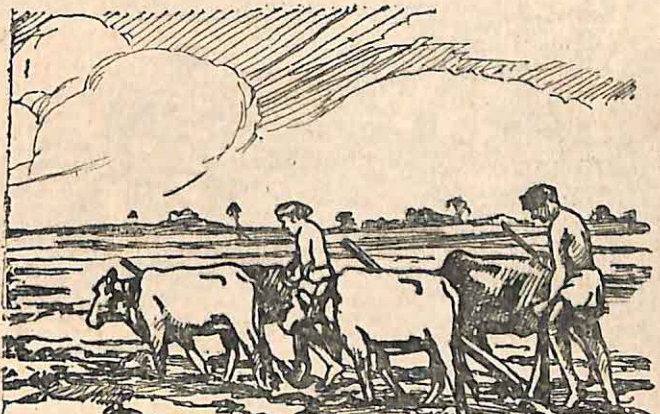
বিজ্ঞান

ভূগোল

১

সমাজের কয়েকজন বন্ধু

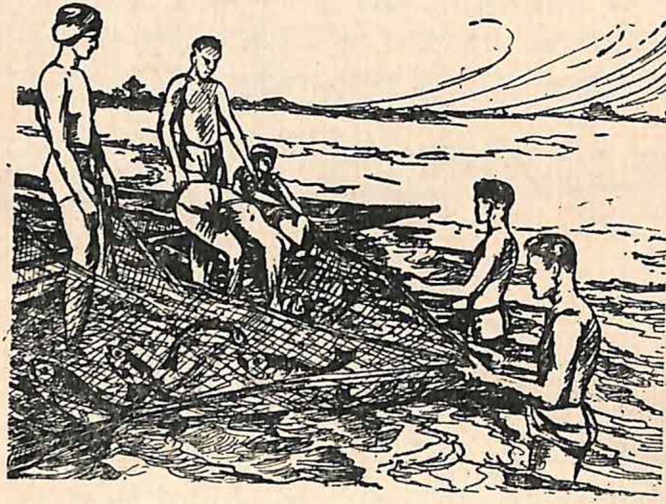
বাঁচতে গেলে আমাদের অনেক জিনিসের দরকার হয়। চাল, ডাল, তরি-তরকারি, মাছ, দুধ ইত্যাদি খাবার জিনিস, পরবার কাপড়-চোপড়, তাছাড়া বাড়িঘর, বাসনকোসন, খাট, চৌকি ইত্যাদি আসবাবপত্র আমাদের



চাষী

সকলেরই দরকার। এই সব জিনিস কারুর একার পক্ষে তৈরি করা সম্ভব নয়। চাষী, তাঁতী, ছুতোর, কামার প্রভৃতি কর্মীরা এইসব ব্যবস্থা করে দেয়। এইজন্যেই এদের সমাজের বন্ধু বলা যেতে পারে।

কৃষক বা চাষী : চাষীদের কথা তোমরা অনেকেই জানো। তারা রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, মাঠে সারাদিন কাজ করে আমাদের আহারের অন্ন যোগায়। সকালে উঠে বলদ আর লাঙ্গল নিয়ে চাষী মাঠে যায়, সারাদিন কাজ করে বিকেল বা সন্ধ্যেবেলায় বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু যারা সকলকার অন্ন যোগাবার জন্যে এত খাটে তাদের জীবন যে খুব সুখে আর আরামে কাটে তা নয়। তাদের ভাগ্যে সবসময় ভাল খাবার



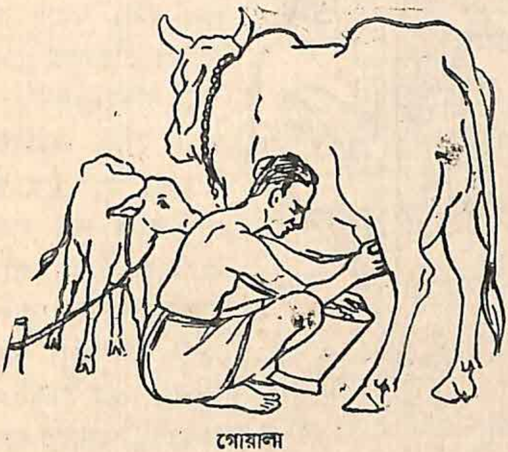
জেলে

জোটে না। ভাতের সঙ্গে মাছ মাংস তো দূরের কথা ডাল এমন কি তরি-তরকারিও অনেক সময় জোটে না। ছোট কাপড় আর গামছাই বেশির ভাগ চাষীর পোশাক। সামান্য জিনিসেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। এরা আমাদের বন্ধু; এদের কখনও ছোট ভেবো না যেন।

জেলে : মাছ আমাদের খুবই দরকারী আর প্রিয় খাদ্য। জেলেরাই সেই মাছ যোগাড় করে দেয়।

আমাদের দেশে খাল, বিল, পুকুর, নদী, নালা অনেক আছে। দিনের বেলায় খাল-বিলের ধারে ধারে ঘুরে বা রাত্রি জেগে জেলেরা মাছ ধরে। বড় বড় নদীতে নৌকো চড়ে মাছ ধরে। নদী থেকে খুব ছোট ছোট মাছের বাচ্চা বা পোনা ধরে পুকুরে ছাড়ে যাতে বড় হলে পরে ধরে বিক্রি করতে পারে। জেলেরা মাছের মতো পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করে দেয়। এইভাবে এরা সমাজের যথেষ্ট উপকার করে।

গোয়ালা : খাঁটি দুধের মতো পুষ্টিকর খাদ্য আর নেই বললেই চলে।

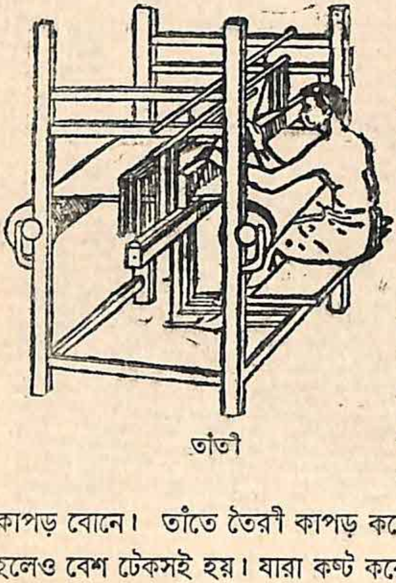


গোয়ালা

গ্রামে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দু-একটা গরু থাকে। শহরে জায়গার অভাবে বাড়িতে গরু পোষার সুবিধে খুবই কম। সেইজন্যে শহরের বাইরে থেকে দুধ এনে গোয়ালারা বিক্রি করে। তবে শহরের মধ্যেও কোন কোন জায়গায় গোয়ালারা গরু পোষে। সেগুলিকে খাটাল বলে। গোয়ালারা দুধ দিয়ে দই, ছানা, মাখন, ঘি ইত্যাদি তৈরি করেও বিক্রি করে। আমাদের দেশে খাঁটি দুধের অভাব খুব বেশী। যারা গরু পুষে

বা অন্য জায়গা থেকে দুধ ইত্যাদি এনে ঐ সব খাঁটি জিনিসের যোগান দেয় তারা আমাদের উপকারী বন্ধু।

তাঁতী : খাওয়া পরার জিনিস আর থাকবার জায়গা, এই তিনটেই আমাদের বাঁচবার জন্যে বিশেষ দরকার। চাষীরা আমাদের চাল, গম ইত্যাদি খাবার জিনিস যোগায় আর তাঁতীরা যোগায় পরবার কাপড়-চোপড় ইত্যাদি। কাপড়ের কল হবার আগে সব কাপড়-চোপড় তাঁতীরাই বুনতো তাদের হাতে চালানো তাঁতে। এখন কলে আর তাঁতে দুভাবেই কাপড়-চোপড় তৈরী হয়, আর আমরা দুরকম কাপড়ই ব্যবহার করি। আগে চরকা বা তকলিতে সুতো কেটে সেই সুতোয় কাপড় বোনা হত। আজকাল বেশির ভাগ তাঁতীই কলে তৈরী সুতো দিয়ে কাপড় বোনে। তাঁতে তৈরী কাপড় কলে তৈরী কাপড়ের মতো মিহি না হলেও বেশ টেকসই হয়। যারা কষ্ট করে আমাদের কাপড়-চোপড় যোগায় তারা সমাজের বিশেষ বন্ধু।



তাঁতী

ঘরামি আর রাজমিস্ত্রী : গ্রামে বেশির ভাগ বাড়ির দেওয়াল মাটির, আর চাল খড়ের। কেবল গ্রামে যাদের অবস্থা খুব ভাল তাদের, আর শহরের বেশির ভাগ লোকের বাড়ি পাকা। ঘরামি খড়ের ঘর তৈরি আর মেরামত করে। রাজমিস্ত্রীরা তৈরি করে পাকা বাড়ি।

ঘরামি আর রাজমিস্ত্রীদের বেশির ভাগ লোকই লেখাপড়া জানে না। কিন্তু কেমন সুন্দর খড়ের ঘর বা পাকা বাড়ি তৈরি করে তারা সব লোকেদের বাসের জায়গার বন্দোবস্ত করছে। এরা নিশ্চয়ই আমাদের উপকারী বন্ধু।

ছুতোর আর কামার : বাড়িঘর তৈরি করতে কাঠের দরজা জানলা দরকার হয়। বাড়িতে, স্কুলে বা অন্যত্র ব্যবহারের জন্যে আসবাবপত্র,



রাজমিস্ত্রী

চাষের লাঙলের অংশ, গরুর গাড়ির চাকা ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে ছুতোরের দরকার হয়।

কামাররা লোহা দিয়ে কাটারি, কোদাল, কুড়ুল, লাঙলের ফাল আর নানা রকমের দরকারী যন্ত্রপাতি তৈরি করে। এথেকে বোঝা যায় যে, আমাদের সমাজে ছুতোর আর কামারের প্রয়োজন কত।

কুমোর : এরা মাটি দিয়ে হাঁড়ি, কলসী, কুঁজো ইত্যাদি জিনিস তৈরি করে। মাটির জিনিসের দাম কম বলে সাধারণ লোকেরা এইসব জিনিস বেশী ব্যবহার করে। বিয়ে, শ্রাদ্ধ ও পূজাপার্বণেও মাটির থালা, সরা, গ্লাস, কলসী ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

ঝাড়ুদার আর মেথর : যারা শহরে থাক তারা দেখে থাকবে যে প্রত্যেক দিন কিছু লোক রাস্তা ঝাঁট দিয়ে ময়লাগুলো এক জায়গায় জমা করে



ঝাড়ুদার

রাখে। এদের বলা হয় ঝাড়ুদার। ঐ ময়লা, গাড়ি করে শহরের বাইরে নিয়ে ফেলা হয়। যেসব জায়গায় খাটা-পায়খানা আছে সেখানে কিছু

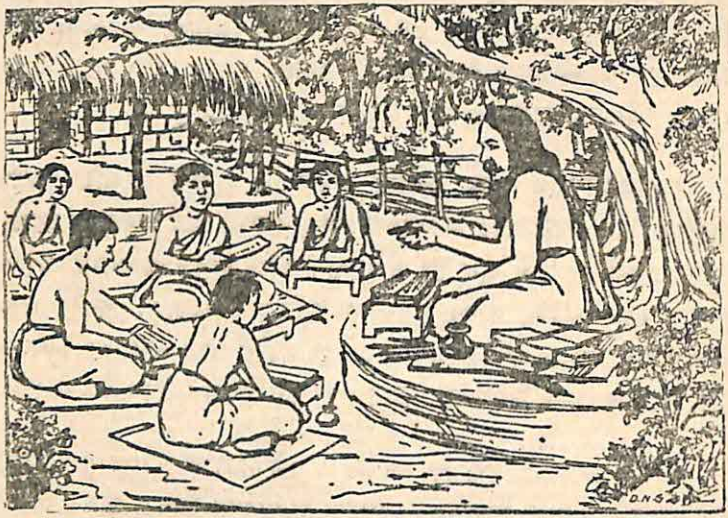
লোক টিনে করে পায়খানার মল নিয়ে যায়। অনেক শহরে ময়লার গাড়িতে ঐসব মল নিয়ে শহরের বাইরে মাটিতে পঁুতে ফেলা হয়। যারা এ কাজ করে তাদের বলা হয় মেথর।

ঝাড়ুদার আর মেথর নোংরা, ময়লা, মলমূত্র ইত্যাদি পরিষ্কার করে আমাদের নানা রকম অসুখ-বিসুখের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখে। আগে এদের নোংরা আর অচ্ছুত বলে অনেকেই ঘেন্না করতো। কিন্তু তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখ যারা এইরকম নোংরা জিনিস পরিষ্কার করে আমাদের অসুখ-বিসুখ থেকে বাঁচিয়ে রাখছে তাদের ঘেন্না করা অন্যায় কিনা। এরা আমাদের সমাজের বিশেষ বন্ধু।

ডাক্তার-কবিরাজ আর মাস্টার মশায় : আগেই বলেছি প্রথমে আমাদের চাই খাবার, তারপর পরবার কাপড়-চোপড় আর থাকবার জায়গা। কিন্তু এখনকার যুগে শুধু কি ঐগুলো পেলেই হবে? আমাদের অসুখ-বিসুখ হলে ডাক্তার, কবিরাজ কিংবা হেকিমের দরকার। শরীর যখন ভাল থাকে তখনও এঁদের সাহায্য চাই। শরীর ভাল থাকলেও কিভাবে রোগের হাত থেকে নিজেদের বাঁচান যাবে সে বিষয়ে তাঁরা উপদেশ দেন।

মাস্টার মশায়রা লেখাপড়া শেখান। প্রাচীনকালে পৃথিবীর কয়েকটা মাত্র দেশে লেখাপড়া ভালভাবে শেখানর বন্দোবস্ত ছিল। এইসব দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ ছিল একটি। সেই সময় আমাদের দেশের বিদ্বান্ পণ্ডিতেরা লেখাপড়া শেখানকে সমাজের বিশেষ কাজ বলে মনে করতেন। মানুষকে সেবা করা যেমন আমাদের ধর্ম সেরকম লেখাপড়া শেখানও একটা ধর্ম বলে মনে করতেন, ছাত্রদেরও শেখার যথেষ্ট আগ্রহ থাকত আর পণ্ডিত মশায় বা গুরুদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর ভক্তি করত। অনেক দূর দেশ থেকেও পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষে আসতেন লেখাপড়া শেখার জন্যে।

তোমরা চাষী, তাঁতী, ছুতোর, কুমোর, কামার ইত্যাদি শিল্পীদের কথা জেনেছ। কয়েক শ বছর আগেও বাংলাদেশ শুধু যে চাষবাসের জন্যেই বিখ্যাত ছিল তা নয়; শিল্পপ্রধান দেশ বলেও এর খ্যাতি ছিল। তখন দেশের খাওয়া পরা ইত্যাদির জন্যে যা যা দরকার সব কিছুই এ দেশেই পাওয়া যেত। তাঁতী, কামার, ছুতোর প্রভৃতি সকলেরই হাতে



প্রাচীন ভারতবর্ষের বিদ্যালয়

যথেষ্ট কাজ ছিল। এখন বড় বড় কল-কারখানা হওয়ার ফলে অনেকেরই কাজ কমে গেছে। তার একটা কারণ নূতন নূতন যন্ত্রপাতির ব্যবহার। ফলে এইসব শিল্পের অনেক উন্নতি হয়েছে। ভালভাবে যে কোনও কাজ করতে গেলে খানিকটা লেখাপড়া জানা দরকার। শিল্পীরাও শিক্ষিত হলে শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হতে পারে। লেখাপড়া শেখা এইসব

শিল্পের আরও উন্নতির জন্যে দরকার। মাস্টার মশায়রা লেখাপড়া শিখিয়ে সবরকমের মানুষকেই আরও বড় আর ভাল করে তোলার কাজে নিজেদের লাগিয়েছেন। তাঁরা যে সমাজের কত বড় কাজ করছেন তা তোমরা বুঝতেই পারছ।

উত্তর লেখ

১। সমাজের বন্ধু বলতে কাদের বোঝায়? এদের কেন 'সমাজ বন্ধু' বলা হয়?

২। বাঁচতে গেলে মানুষের প্রথমেই কি কি দরকার? এগুলো কারা যোগায়?

৩। চাষীকে তার কাজের জন্যে কার কার ওপর নির্ভর করতে হয়? চাষ করতে গেলে কি কি জিনিসের দরকার?

৪। মাস্টার মশায়রা সমাজের সব থেকে বড় কাজ করেন কি? এ সম্বন্ধে তোমার মত কি লেখ।

২

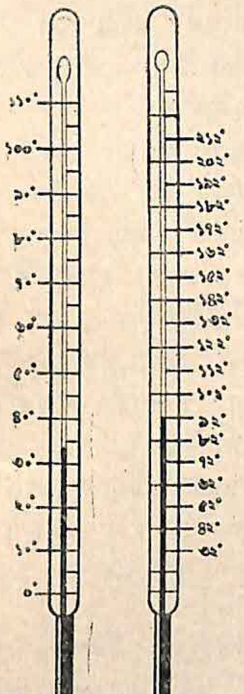
আবহাওয়া আর জলবায়ু

আবহাওয়া : কোন জায়গার প্রতিদিনের জল, হাওয়া, তাপ ইত্যাদির অবস্থাকে ঐ জায়গার সেইদিনের আবহাওয়া বলে। হয়ত তোমরা দেখেছ কোনদিন খুব গরম হাওয়া বয়, কোনদিন ঠান্ডা; কোনদিন শুকনো থাকে আবার কোনদিন বা বৃষ্টি হয়। এক একদিন হাওয়া যেন নেই বলে মনে হয় আবার এক একদিন ঝড় বয়ে যায়। এইসব অবস্থা আমরা মাপতে পারি কিভাবে সেটাই নিচে বলা হয়েছে।

উষ্ণতা : জল বা অন্য কোন জিনিসকে আগুনে গরম করলে তা ক্রমশই গরম বা উষ্ণ হতে থাকে। এই যে গরম বা উষ্ণ অবস্থা বা জিনিসটা কতটা গরম একে উষ্ণতা বলে। সেইরকম জিনিসের ঠান্ডা অবস্থাও মাপা যায়। পৃথিবীর চারদিকে যে বায়ুমন্ডল ঘিরে রয়েছে সূর্যের তাপে তা গরম হয়ে ওঠে। বায়ুমন্ডল কতটা গরম বা ঠান্ডা সেটা কিভবে আমরা ঠিক করি তা এখন বলা হবে।

তাপমান যন্ত্র বা থার্মোমিটার : জ্বর হলে কতটা জ্বর হয়েছে, মানে শরীর কত গরম হয়েছে মাপবার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে থার্মোমিটার বা তাপমান যন্ত্র বলে। যন্ত্রটা দুই-মুখ-বন্ধ একটা কাচের নল। এর সরু দিকটা চকচকে পারায় ভরতি। ডাক্তারী থার্মোমিটারের গায়ে ৯৫ থেকে ১১০ পর্যন্ত দাগ কাটা আছে। ঐ দাগগুলোকে উষ্ণতা বা গরম মাপবার সঙ্কেত বা ডিগ্রি বলা হয়। জ্বর বাড়া-কমার সঙ্গে থার্মোমিটারে পারা কেন ওঠা-নামা করে বোধ হয় জান না। এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় আগুনের ওপর সাবধানে গরম করে থার্মোমিটারের পারার ওপর ধর। দেখবে পারা কি রকম ধাপে ধাপে ওপরে উঠে যায়। সব

জিনিসই গরম পেলে আকারে বাড়ে এবং ঠাণ্ডায় কমে যায়। গরম পেয়ে পারাও বেড়ে গিয়ে ফাঁকা সরু নলের ভেতর দিয়ে ওপরে উঠে। সুতোর মতো সরু পারার মাথাটা যে দাগ পর্যন্ত ওঠে, সেটাই হল গরম বা উষ্ণতার মাপ। এই মাপ আমরা ডিগ্রিতে হিসেব করি।



থার্মোমিটার

গরম জল, হাওয়া ইত্যাদি মাপার জন্যে আরও বড় বড় থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়। ছবিতে এরকম দুটো থার্মোমিটার দেখান হয়েছে। বাঁদিকের থার্মোমিটারের সঙ্কেত বা স্কেলে ০° ডিগ্রি থেকে ১১০° ডিগ্রি পর্যন্ত দাগ কাটা। এসব ডিগ্রির মাপ কিভাবে ঠিক করা হয়? থার্মোমিটারটা এমনভাবে তৈরী যে পারায় ভরতি অংশটা গলে যাচ্ছে এরকম বরফের গুঁড়োর মধ্যে বসিয়ে রাখলে বরফের ঠাণ্ডায় পারা গুটিয়ে আসতে থাকে বা সংকুচিত হতে থাকে। ফলে পারা তলার দিকে নেমে আসে আর শেষে একটা জায়গা পর্যন্ত এসে স্থির হয়ে দাঁড়ায়, আর নামে না। কাচের নলটার গায়ের এই জায়গায় ০° ডিগ্রির দাগ দেওয়া হয়। এর মানে গলে যাচ্ছে এরকম বরফের তাপমাত্রা ০° ডিগ্রি। এর পরে ফুটন্ত জলের যে বাষ্প উঠছে তার মধ্যে থার্মোমিটারটার পারায় ভরতি অংশ রাখলে পারা আকারে বেড়ে গিয়ে কাচের নলটার যে পর্যন্ত উঠে যাবে,

২

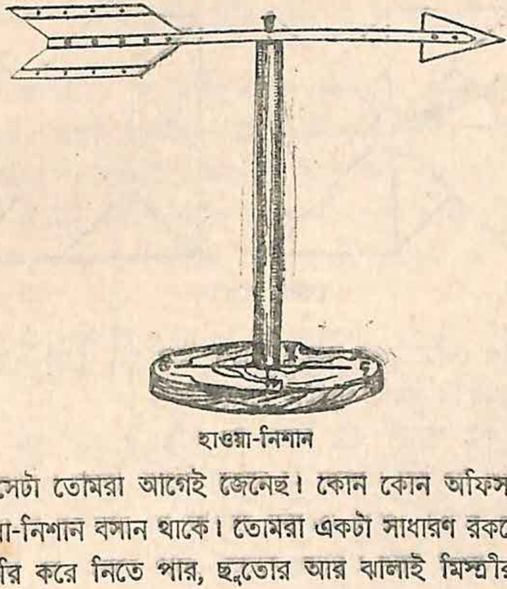
সেখানে ১০০° ডিগ্রির দাগ দেওয়া হয়। এইসব করার সময় বায়ুমণ্ডলের চাপ যেন সাধারণ অবস্থায় থাকে। বরফ গলার ঠাণ্ডা অবস্থা থেকে ফুটন্ত জলের বাষ্পের গরম যতটা বেশী তা হিসেবের জন্যে থার্মোমিটারের নলের গায়ে ঠিক ১০০টা সমান ভাগে ভাগ করে দাগ কাটা হয়। দাগের এই এক এক অংশকে উষ্ণতার ১ ডিগ্রি বলা হয়। এই স্কেলে ১০০ ভাগ থাকায় ইংরেজীতে একে **সেণ্টিগ্রেড স্কেল** বলে। এখানে ছবিতে অবশ্য আরও ১০° মানে ১১০° ডিগ্রি দেখান হয়েছে।

বৈজ্ঞানিক ফারেনহিটের নামে আর একরকমের স্কেলেও উষ্ণতা মাপা যায়। এর নাম ফারেনহিট স্কেল। এই স্কেলেতে ৩২° ডিগ্রিতে বরফ গলে; ২১২° ডিগ্রি হল ফুটন্ত জলের উষ্ণতা। জ্বর দেখবার যে থার্মোমিটার তাতে ফারেনহিট্ স্কেল রয়েছে। মাপের কাজে দশমিক প্রণালী চালু হওয়ার পর বায়ুর উষ্ণতা সেণ্টিগ্রেড স্কেলে মাপা হয়ে থাকে। কোন জিনিস কত গরম সেটা জানতে গেলে থার্মোমিটারের বাল্ব ঐ জিনিসের সংস্পর্শে আনলে পারা নলের যে দাগ পর্যন্ত ওঠে, সেটাই হল ঐ জিনিসের উষ্ণতার মাপ। হাওয়ার উষ্ণতা মাপতে গেলে থার্মোমিটার খোলা জায়গায় বেশ হাওয়া খেলে এমন একটা কাঠের বাক্সে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। বাক্সটা যেন মাটি থেকে কয়েক হাত ওপরে থাকে আর কাছাকাছি অন্য জিনিস যেন না থাকে যা থেকে তাত এসে থার্মোমিটারের গায়ে লাগে।

বায়ুপ্রবাহ : মাছ যেমন জলের মধ্যে থাকে আমরাও সেইরকম বায়ু-মণ্ডলের মধ্যে রয়েছি। এই বায়ু বা হাওয়া যখন বইতে থাকে আমরা তাকে বলি বাতাস। যখন খুব রোদ হয় তখন সেই গরমে পৃথিবীর ওপরটা গরম হয়ে যায়। ফলে তার ওপরের হাওয়াও গরম হয়ে ওঠে। ডাঙার মাটি, পাথর ইত্যাদি যত তাড়াতাড়ি গরম হয়, পুকুর, নদী, সমুদ্র ইত্যাদির জল আর তাদের ওপরকার হাওয়া তত তাড়াতাড়ি গরম হয় না। ডাঙার ওপরকার হাওয়া তাড়াতাড়ি গরম হয়ে আকারে বেড়ে যায়।

তখন হালকা হাওয়া ওপরে উঠে যায়। যেখান থেকে এই গরম হাওয়া ওপরে উঠছে সেই ফাঁকা জায়গা ভরতি করার জন্যে জলের ওপরের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা হাওয়া ডাঙ্গার ঐ জায়গায় ছুটে আসে। ডাঙ্গার আশপাশের ঠান্ডা জায়গা থেকেও গরম জায়গায় হাওয়া চলে। এইরকম হাওয়া চলাচলকে বলা হয় বায়ুপ্রবাহ বা বাতাস। সমুদ্রের দিক্ থেকে হাওয়া এলে তার সঙ্গে অনেক জলীয় বাষ্প থাকে। এই জলীয় বাষ্প থেকেই মেঘের সৃষ্টি হয়।

হাওয়া-নিশান : হাওয়া-নিশান দিয়ে কিভাবে হাওয়ার দিক্ ঠিক



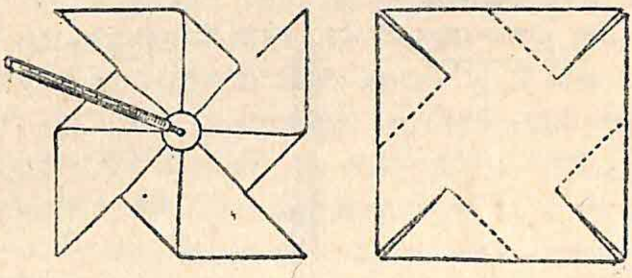
হাওয়া-নিশান

করা যায় সেটা তোমরা আগেই জেনেছ। কোন কোন অফিস বা বাড়ির ছাদে হাওয়া-নিশান বসান থাকে। তোমরা একটা সাধারণ রকমের হাওয়া-নিশান তৈরি করে নিতে পার, ছুতোর আর ঝালাই মিস্ত্রীর সাহায্যে।

এক টুকরো কাঠের উপর একটা খুঁটি ঠিক খাড়াভাবে আট্‌কে রাখতে হবে। পাতলা টিনের একটা তীর তৈরি করে একটা সরু পেরেক দিয়ে সেটা খুঁটির মাথায় আলগাভাবে বসিয়ে দিতে

হবে। কাঠের টুকরোর উপর পূর্ব-পশ্চিম আর উত্তর-দক্ষিণ চিহ্ন ঠিক করে রাখতে হবে। হাওয়া লাগলে তীরটার মুখ হাওয়ার দিকে আর চওড়া লেজটা উল্টোদিকে থাকবে। ছবিতে যন্ত্রটার পাদানের দিকে লক্ষ্য কর তীরের মুখটা দক্ষিণ দিকে রয়েছে। এই দিকেই হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

হাওয়ার বেগ : হাওয়া কোন্ দিক্ থেকে আসে জানার সঙ্গে হাওয়া কত জোরে বয়ে যাচ্ছে জানতে পারলে আবহাওয়ার খবর আরো ভালভাবে পাওয়া যায়। অল্প হাওয়ায় গাছের পাতা আর সরু ডাল নড়ে; হাওয়া



খেলার ঘুরনি

বাড়লে আরও মোটা ডাল নড়তে থাকে আর ঝড় হলে গাছের মোটা মোটা ডাল এমন কি সমস্ত গাছটাই দুলতে থাকে।

হাওয়া কত জোরে বয়ে যাচ্ছে বা হাওয়ার বেগ কম কি বেশী জানবার জন্যে তোমরা কাগজ বা রাংতা দিয়ে একটা খেলনা সহজেই তৈরি করতে পার। এসব খেলনা মেলায় বা রাস্তায় ফেরীওয়ালারা বিক্রি করে। লম্বা আর চওড়ায় সমান একটা কাগজ বা রাংতা নিয়ে, ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে ঐরকম করে চারটে কোণ কিছুদূর পর্যন্ত কেটে ভাঁজ কর। কোণগুলি মাঝখানে এনে মেলাবার পর তার উপর একটা চাকতি লাগিয়ে একটা সরু কাঠ বা শলা এদের মধ্যে ঢুকিয়ে

দাও। এভাবে কাগজের ভাঁজে চারটে পকেট তৈরী হবে আর হাওয়া লাগলে সমস্ত জিনিসটা একদিকে ঘুরবে। একে বলে ঘুর্নি। হাওয়ার জোর যত বাড়বে ঘুর্নি তত জোরে ঘুরবে।

মেঘ আর বৃষ্টি : প্রথম পরীক্ষা—জল গরম করে ফোটাতে থাকলে দেখবে জল ধোঁয়ার মতো হয়ে উড়ে যাচ্ছে আর জলের পরিমাণও কমে যাচ্ছে। এই ধোঁয়া হয়ে যাওয়া জলকে বাষ্প বলে।

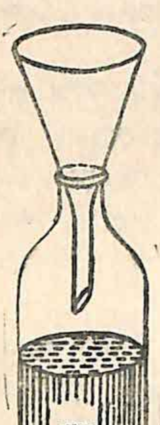
দ্বিতীয় পরীক্ষা—ফোটান জল থেকে এই যে বাষ্প উঠছে তার ওপরে স্লেট বা থালা বা অন্য কিছু ধরলে দেখবে যে তাতে বিন্দু বিন্দু জল জমছে।

তৃতীয় পরীক্ষা—খুব ঠাণ্ডা বরফ জল যদি একটা গ্লাসে রাখ দেখবে একটু পরেই গ্লাসের বাইরের দিক্‌টা একটু ঘোলাটে হয়ে এসেছে। খানিক বাদে গা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়বে। হাওয়াতে যে জলীয় বাষ্প আছে ঠাণ্ডা গ্লাসের গায়ে লেগে তা ছোট ছোট জলের কণায় পরিণত হয়। তারা গায়ে গায়ে লেগে গেলে গ্লাসের গা বেয়ে নিচে নামতে থাকে।

হাওয়ার এই জলীয় বাষ্প তা আসে কোথা থেকে? নদী, পুকুর, খাল, বিল, বিশেষ করে সমুদ্র থেকে সূর্যের তাপে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে হাওয়ার সঙ্গে মিশে থাকে। এই বাষ্প চোখে দেখা যায় না; ঠাণ্ডা হয়ে জলের কণা হলে তখনই চোখে পড়ে। পাহাড়ের যত উপরের দিকে উঠবে তত ঠাণ্ডা বাড়বে। এর কারণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের যত উপরের দিকে উঠা যায় ততই ঠাণ্ডা বাড়তে থাকে। জলীয় বাষ্প উপরের দিকে উঠলে, ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে এসে ঐ জলীয় বাষ্প ছোট ছোট জলের কণা হয়ে যায়। এ অবস্থায় এরা এত ছোট থাকে যে তারা হাওয়ায় ভাসতে থাকে আর ভাসতে ভাসতে এক সঙ্গে মিলে মেঘ হয়ে যায়। মেঘগুলো আরও ঠাণ্ডা হলে এইসব ছোট ছোট জলের কণা মিলে বড় বড় ফোঁটার আকারে পৃথিবীর উপর পড়ে। এদেরকেই বৃষ্টি বলা হয়।

আকাশে নানারকমের মেঘ দেখা যায়। কোন মেঘ খুব উঁচুতে আবার কোন মেঘ নিচে থাকে। শরৎকালে সাদা তুলোর মতো এক রকমের মেঘ আকাশে ভাসে। বর্ষাকালে যে মেঘ দেখা যায় সেগুলি ওরকম কোন নির্দিষ্ট চেহারার নয়। এরা কাল রঙের আর খুব নিচু দিয়ে ভেসে যায়। এদের বাদল-মেঘ বলা যেতে পারে।

বৃষ্টি মাপার যন্ত্র : একটা সরু-গলা বোতলে এমন একটা টিনের ফাঁদালো বসাও যাতে বোতলের মুখে বসালে ফাঁদালোর নলের তলার দিক্‌টা ঠিকমতো বসে। বোতলের মুখ আর ফাঁদালোর নলের মাঝের ফাঁক মোম দিয়ে বন্ধ কর। তারপর ঐ ফাঁদালো লাগানো বোতলটা একটা খোলা জায়গায় রাখ। বৃষ্টি হলে এই বোতলে খানিকটা জল জমা হবে। এই জল মেপে কতটা বৃষ্টি হয়েছে তা ইঞ্চি বা সেণ্টিমিটারে মাপা যায়। এক একদিন খুব বেশী বৃষ্টি বা কম বৃষ্টি হয়। কলকাতায় বৃষ্টি হয় সারা-বছরে প্রায় ৭০ ইঞ্চি।

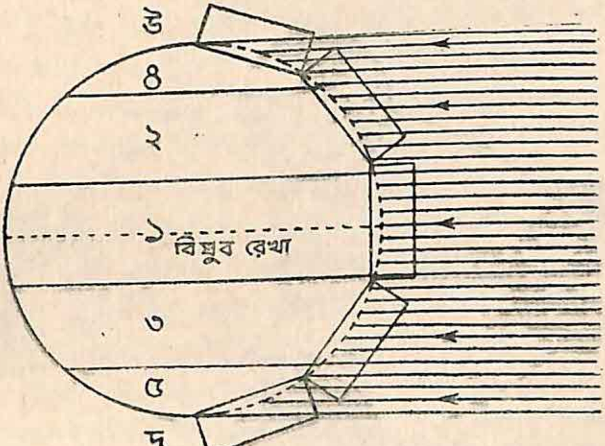


বৃষ্টি মাপার যন্ত্র

জলবায়ু : আগেই বলা হয়েছে কোন এক জায়গার অল্প সময়ের বা একদিনের উষ্ণতা, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ, বায়ুপ্রবাহ ইত্যাদির অবস্থাকে ঐ জায়গার ঐ সময়ের আবহাওয়া বলে। কোন জায়গার কয়েক বছরের আবহাওয়ার গড় হিসাব নিলে সেই জায়গার আবহাওয়ার মোটামুটি একটা ধারণা আমরা পেতে পারি; একেই ঐ জায়গার জলবায়ু বলা হয়।

পৃথিবী গোল বলে তার বিভিন্ন জায়গায় একইভাবে সূর্যের আলো পড়ে না। ছবিতে দেখ যে বিষুবরেখার কাছাকাছি জায়গায় খাড়াভাবে সূর্যের আলো পড়ে। ঐসব জায়গায় সূর্যরশ্মি বা রোদ বেশী তেজী। বিষুবরেখা থেকে যতই উত্তর বা দক্ষিণ মেরুর দিকে যাওয়া যায়, ততই

সূর্যের আলো তের্ছাভাবে পড়ে; ফলে ঐসব জায়গায় রোদ কম জোর হয়ে আসে আর গরমও কম হয়। সকলেই বোধ হয় জান যে পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলই খুব বেশী রকমের ঠাণ্ডা। তাছাড়া আগেই বলেছি যত উঁচুতে যাবে ততই ঠাণ্ডা বাড়বে। কাজেই কোন জায়গার জলহাওয়া ঐ জায়গা কত উঁচুতে তার উপরেও নির্ভর করে। দার্জিলিং শিলিগুড়ি থেকে প্রায় এক মাইল উঁচুতে। সেইজন্যে শিলিগুড়ি আর তার

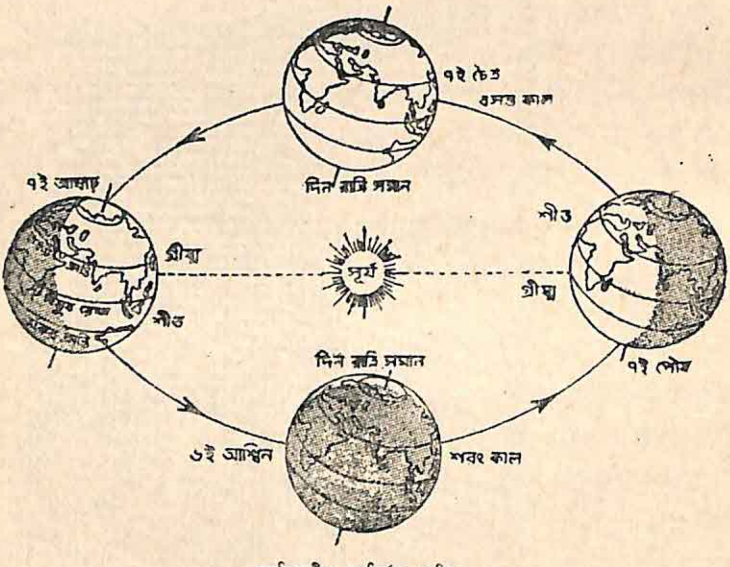


পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সূর্যের আলো কিভাবে পড়ে

কাছাকাছি জায়গায় যখন গরম, দার্জিলিংয়ে তখনও বেশ শীত। বছরের বিভিন্ন সময়ে বা ঋতুতে জলহাওয়ার বদল হয়।

কোন্ জায়গায় কি রকম গাছপালা ও ফল ফসল জন্মায়, জন্তু-জানোয়ার কত প্রকারের, মানুষ কিভাবে থাকে বা কিরকম জীবন যাপন করে, এসব বিশেষভাবে নির্ভর করে সেখানকার জলবায়ুর উপর।

ঋতু-পরিবর্তন : ছায়াকাঠি নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে প্রতিদিন কাঠির ছায়া একজায়গায় স্থির থাকে না, একটু একটু স্থান বদলায়। এক বছর বা ৩৬৫ দিন পরে ঐ ছায়া আবার ঠিক ঐ জায়গায় ফিরে আসে। এর থেকে বোঝা যায় যে সূর্য আর পৃথিবীর মধ্যের দূরত্ব আর পরস্পরের অবস্থান আবার আগের মতো হয়। এ থেকেও পৃথিবী যে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে তা মনে করা যেতে পারে। পৃথিবীর এই বার্ষিক গতি কিরকম এখানে তাই বলা হচ্ছে।



পৃথিবীর বার্ষিক গতি

সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘোরবার পথটা ঠিক গোল নয়। ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে ডিমের মতো অনেকটা সেরকম। পৃথিবী নিজের মেরুরেখার চারদিকে চব্বিশ ঘণ্টায় একবার লাট্টুর মতো পাক খাচ্ছে বলেই দিন আর রাত হচ্ছে। পাক খেতে খেতেই পৃথিবী আবার

সূর্যকে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় একবার প্রদক্ষিণ করে আসছে। ছবিতে তিনমাস পর পর সারা বছরে পৃথিবীর অবস্থান দেখান হয়েছে। প্রথমেই লক্ষ্য করবে যে পৃথিবীর চলার পথের উপর তার মেরুরেখাটি কাত হয়ে আছে, যেমন গ্লোবগুলিতে দেখা যায়। বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময়েও ঐ মেরুরেখাটি একই দিকে একইভাবে কাত হয়ে থাকে। এর ফলে বছরের বিভিন্ন সময়ে জলবায়ু কিরকম বদলায় সেটা এখন বলা হচ্ছে।

৭ই পৌষ (বাইশে ডিসেম্বর)—এই সময় পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু সূর্যের দিকে হেলে থাকে, কাজেই সূর্যের একটু কাছে আসে আর উত্তর মেরু একটু দূরে সরে যায়। ফলে বিষুবরেখার দক্ষিণের অংশে সূর্যের আলোর বেশী অংশ খাড়াভাবে পড়ে; উত্তরদিকে একটু তের্ছাভাবে পড়ে। দক্ষিণ গোলার্ধের অর্ধেকের বেশী ভাগ আর উত্তর গোলার্ধের অর্ধেকের কম ভাগ সূর্যের আলো পায়। এই অবস্থায় পৃথিবীর নিজের মেরুরেখার ওপর ঘুরছে; ফলে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন বড় আর উত্তর গোলার্ধে দিন ছোট হয়। আমাদের দেশ বিষুবরেখার উত্তরে। কাজেই এই সময়ে সূর্যের আলো আমরা তের্ছাভাবে পাই, আর দিন ছোট বলে সূর্যের আলো পাই অপেক্ষাকৃত কম সময়। এই দুই কারণে ঐ সময় আমাদের দেশে **শীতকাল** আর যেসব দেশ বিষুবরেখার দক্ষিণে, যেমন অস্ট্রেলিয়া, তাদের ঐ সময় **গ্রীষ্মকাল**। ৭ই পৌষ আমাদের সবচেয়ে ছোটদিন আর বড় রাত্রি। ঐদিন সূর্যের গতিপথ বিষুবরেখার দক্ষিণে আর একটি কাল্পনিক রেখার ওপর থাকে। এ রেখাটিও পৃথিবীকে ঘিরে আছে আর এর নাম মকরক্রান্তি রেখা।

৭ই চৈত্র (একুশে মার্চ)—৭ই পৌষের পর পৃথিবী যতই তার কক্ষ বা ঘোরা পথে চলতে থাকে ততই পৃথিবীর উত্তর মেরু সূর্যের দিকে আসতে থাকে আর দক্ষিণ মেরু সরে যেতে থাকে। ৭ই চৈত্র নাগাদ উত্তর আর দক্ষিণ দুই মেরুই সূর্য থেকে সমান দূরে থাকে, আর সূর্য খাড়াভাবে বিষুবরেখার ওপর আলো দেয়। পৃথিবীর দুই গোলার্ধেই

তখন অর্ধেক ভাগে আলো আর অর্ধেক ভাগে অন্ধকার। পৃথিবী নিজের কক্ষে এই অবস্থায় ঘোরে বলে দিনরাত্রি সমান হয়। সেখানে তখন দুপুর বেলার সূর্য একেবারে মাথার ওপর থাকে। আমাদের দেশে এই সময় **বসন্তকাল**। আকাশে সূর্যের গতিপথ ৭ই পৌষের পর থেকে উত্তর দিক্ থেকে সরতে সরতে ৭ই চৈত্র বিষুবরেখার ওপর আসে। সূর্যের এই উত্তরমুখী গতিকে উত্তরায়ণ বলে।

৭ই আষাঢ় (বাইশে জুন)—৭ই চৈত্রের পর পৃথিবীর গতির ফলে উত্তর মেরু সূর্যের দিকে ক্রমশ হেলতে থাকে, আর এই গোলার্ধের অর্ধেকের বেশী অংশ আলো পেতে থাকে। আগের মতোই পৃথিবী নিজের কক্ষের চারদিকে ঘোরে বলেই দিন বড় আর রাত ছোট হয়। সূর্যের এই উত্তরদিকে যাওয়া শেষ হয় ৭ই আষাঢ়, বিষুবরেখা বা মকরক্রান্তি রেখার মতো আর একটি কাল্পনিক রেখাতে গিয়ে। কাল্পনিক এই রেখার নাম কর্কটক্রান্তি রেখা; এটিও সারা পৃথিবীকে ঘিরে আছে। এই রেখা পশ্চিমবঙ্গের কাক্সা, পূর্বস্থলী, আর নবদ্বীপের চার মাইল উত্তরদিক্ দিয়ে গিয়েছে। এই সময় সূর্যের আলো আমাদের দেশে বেশী সময় খাড়াভাবে পড়ে। আর দিন বড় বলে সূর্যের তাপও অনেক বেশী সময় ধরে পাওয়া যায়। এই জন্যেই তখন পশ্চিমবঙ্গে গ্রীষ্মকাল। ৭ই আষাঢ় সবথেকে বড় দিন আর সবচেয়ে ছোট রাত্রি। পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে তখন ঠিক উল্টো অবস্থা মানে শীতকাল, দিন সবচেয়ে ছোট আর রাত সবথেকে বড়। ৭ই আষাঢ় সূর্যের উত্তরায়ণ শেষ হয় আর তার পর থেকেই দক্ষিণায়ন শুরু হয়।

৬ই আশ্বিন (তেইশে সেপ্টেম্বর)—৭ই আষাঢ়ের পর থেকে পৃথিবীর উত্তর মেরু সূর্য থেকে দূরে যেতে থাকে আর দক্ষিণ মেরু কাছে আসতে থাকে। উত্তর গোলার্ধের জায়গাগুলো সূর্যের আলো কম পেতে থাকে আর দক্ষিণ গোলার্ধের জায়গাগুলো আলো বেশী পেতে থাকে। এইভাবে ৬ই আশ্বিন আবার সূর্য বিষুবরেখার ওপর আসে,

তখন দিন আর রাত সমান হয়। তখন উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল। এর পর উত্তর গোলার্ধে আলো কম সময় পড়তে থাকে আর দিন ছোট হতে থাকে। সূর্যের দক্ষিণদিকে সরে যাওয়া বা দক্ষিণায়ন শেষ হয় ৭ই পৌষ। সেই সময় সূর্য মকরক্রান্তির ওপর থাকে।

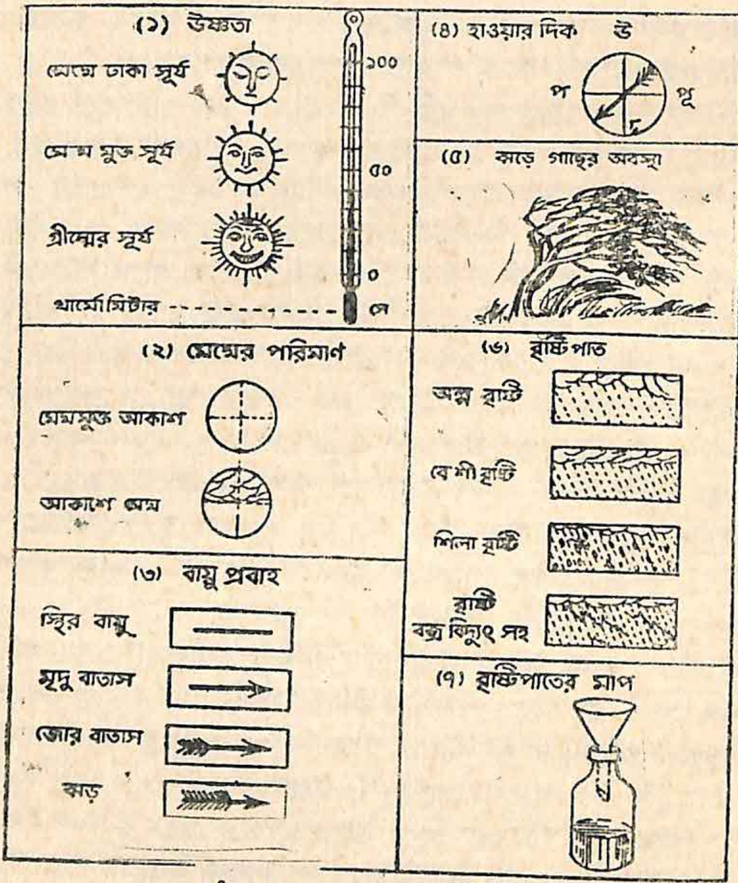
এখন বোঝা যায় যে, পৃথিবীর মেরুরেখা তার গতিপথের ওপর একটু হেলে থেকে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলেই কিছুদিন পর পরই যেকোন জায়গার জলবায়ুর বিশেষ পরিবর্তন হয়। জলবায়ুর যে বিশেষত্ব আমরা পাই বিশেষ বিশেষ সময়ে তাকেই আমরা ঋতু বলে থাকি। অবশ্য শুধু সূর্যের জন্য নয় অন্য কারণেও, ঋতুর পরিবর্তন হয়। আমাদের দেশে বেশী বৃষ্টি হয় আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে। এই দুটি মাসকে আমরা বলি **বর্ষাকাল**। শরৎকাল থেকে শীতকালের জলবায়ুর পরিবর্তন আমাদের দেশে কার্তিক আর অগ্রহায়ণ মাসে হয় বলে ঐ দুই মাসকে **হেমন্তকাল** ধরা হয়। এভাবে বার মাসকে ছয় ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। যথা—বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ দুই মাস **গ্রীষ্মকাল**, আষাঢ়-শ্রাবণ দুই মাস **বর্ষাকাল**, ভাদ্র-আশ্বিন দুই মাস **শরৎকাল**, কার্তিক-অগ্রহায়ণ দুই মাস **হেমন্তকাল**, পৌষ-মাঘ দুই মাস **শীতকাল** এবং **বসন্তকাল** হল ফাল্গুন আর চৈত্র মিলে।

আবহাওয়ার ছবি : আবহাওয়ার বিভিন্ন অবস্থা কি করে জানা যায় আগে বলা হয়েছে। প্রত্যেক দিন এদের ছবি এঁকে রাখলে সারা বছরে আবহাওয়ার কি রকম পরিবর্তন হয় সহজেই বোঝা যায়। এসব ছবি পর পর দেখে ঝড়-বৃষ্টির আভাস পাওয়া যায়।

আবহাওয়ার বিভিন্ন বিষয় এইভাবে ছবি এঁকে দেখান যায় :

(১) উষ্ণতা—উষ্ণতা ঠিকমতো মাপতে গেলে থার্মোমিটারের দরকার এ আগেই বলা হয়েছে। রৌদ্রের তেজ থেকে উষ্ণতা কেমন হবে সেটা শুধু আন্দাজ করা যায়। প্রথম ছবিটি মেঘে-ঢাকা সূর্য বোঝাচ্ছে; এখানে সূর্যের তেজ কম। তার পরের ছবি একদিনের, মেঘ নেই এমন আকাশে

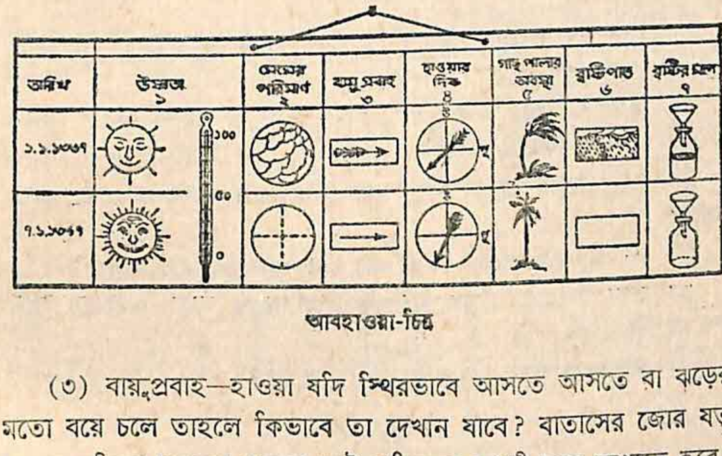
সূর্য রয়েছে বোঝাচ্ছে; রোদের তেজ এ সময় একটু বেশী। পরের



ছবিতে আবহাওয়ার বিভিন্ন বিষয়

ছবি দেখ, গ্রীষ্মেতে মেঘ একেবারে নেই এমন আকাশ আর সূর্য; এই সময় সূর্যের তেজ খুব জোর।

(২) মেঘের পরিমাণ—আকাশের কতখানি অংশ মেঘে ঢাকা রয়েছে বোঝাবার জন্য এই ছবি ব্যবহার করা যেতে পারে। সমস্ত আকাশকে একটা গোল বৃত্ত ধরে নেওয়া হয়েছে; এরপর এটাকে সমান চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। মোটামুটি আকাশের চারভাগের একভাগ যদি মেঘে ঢাকা থাকে তবে বৃত্তের চারভাগের একটা ভাগকে মেঘের মতো এঁকে ঢেকে দাও। আকাশের যতখানি আন্দাজ মেঘ ঢেকে থাকবে বৃত্তটাকে আকাশ ধরে নিয়ে ততখানি মেঘের মতো এঁকে ঢেকে দেবে। সমস্ত আকাশ যদি মেঘে ঢাকা থাকে সমস্ত বৃত্তটাই ঐরকম করে ঢেকে দিতে হবে।



আবহাওয়া-চিত্র

(৩) বায়ুপ্রবাহ—হাওয়া যদি স্থিরভাবে আসতে আসতে বা ঝড়ের মতো বয়ে চলে তাহলে কিভাবে তা দেখান যাবে? বাতাসের জোর যত বাড়বে তীরের লেজের পালক সেই পরিমাণে বেশী করে দেখাতে হবে। হাওয়ার দিক্ তীরের মাথার দিক্ দেখে জানা যাবে; তীরের মাথা হাওয়ার দিকে মুখ করে থাকবে। হাওয়া জোরে বইলে গাছের ডাল, এমন কি গাছও যতটা নুয়ে পড়ে তা ছবিতে দেখাতে হবে।

(৪) বৃষ্টিপাত—অল্প বৃষ্টি, বেশী বৃষ্টি বা শিলাবৃষ্টি ইত্যাদি ছবিতে দেখান হয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে যদি বজ্র বা বিদ্যুৎ থাকে সেটাও দেখান যাবে ছবির মতো করে।

ছবি এঁকে দুদিনের আবহাওয়া কিভাবে দেখান হয়েছে লক্ষ্য কর।

যেসব চাষীরা লেখাপড়া জানে না, তারাও আবহাওয়ার ছবি দেখলে এ বিষয়গুলি বুঝতে পারবে আর দরকার মতো তা নিজের কাজে লাগাতে পারবে।

উত্তর লেখ

১। আবহাওয়া কাকে বলে? আবহাওয়ার অবস্থা জানতে গেলে কি কি মাপতে হয়?

২। আবহাওয়া জানবার জন্য কি কি যন্ত্র ব্যবহার করতে হয়? কিভাবে ঐ সব যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?

৩। আবহাওয়ার সব বিষয়গুলি কিভাবে ছবি এঁকে দেখাতে পার? পাহাড়ে যে বরফ পড়ে সে কিভাবে দেখাবে?

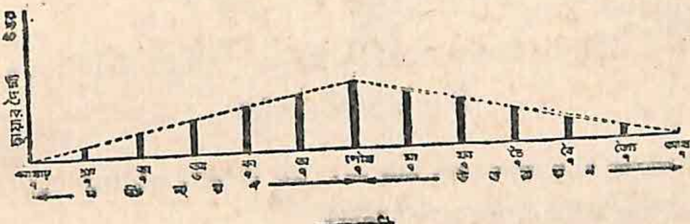
৪। বর্ষার দিনের আর শীতের দিনের আবহাওয়ার অবস্থা লেখ আর এঁকে দেখাও।

৫। জলবায়ু কাকে বলে? আবহাওয়া আর জলবায়ুর মধ্যে তফাত কি?

৬। কোন্ জায়গার জলবায়ু কিসের উপর নির্ভর করে? জলবায়ুর সঙ্গে মানুষের কি সম্বন্ধ?

৭। ঋতু কাকে বলে? কেন ঋতু পরিবর্তন হয়?

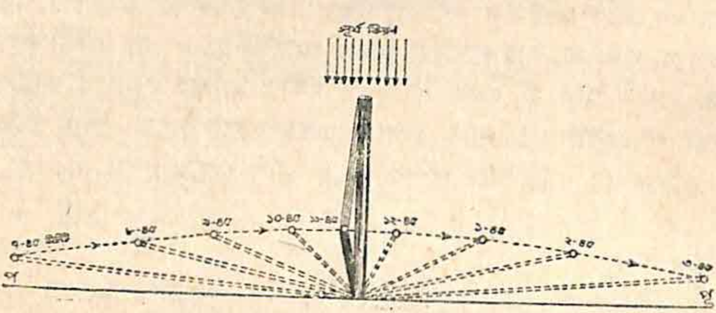
ছায়াকাঠি : কি করে ছায়াকাঠি নিয়ে পরীক্ষা করতে হয় তার কথা আগেই বলা হয়েছে। ঠিক দুপুরবেলা আমাদের দেশে ছায়া উত্তরমুখী হয়ে সব থেকে ছোট হয়। বছরের ভিন্ন ভিন্ন সময় কাঠির ছায়ার পথ একরকম থাকে না, আর দুপুরের ছায়াও ছোটবড় হয়। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় কাঠির ছায়ার পথ একরকম হয় না। ছবিতে যে ছায়ার পথ দেখান হয়েছে সেটা কলকাতায় ছায়াকাঠি নিয়ে পরীক্ষা করে আঁকা হয়েছে।



ছায়াকাঠি

সূর্যের উত্তরায়ণ আর দক্ষিণায়ন : এবার কাঠির ছায়ার পথ সারা বছর কিভাবে বদলে যায় সেটা দেখা যাক্। তোমরা আগেই জেনেছ যে ৭ই আষাঢ় তারিখে ঠিক দুপুরবেলা সূর্য কাক্সা, পূর্বস্থলী আর নবদ্বীপের প্রায় ৪ মাইল উত্তরে কর্কটক্রান্তি রেখার উপর খাড়াভাবে থাকে। কাঠির ছায়া তখন ঠিক কাঠির উপরেই পড়ে, অর্থাৎ কোন ছায়াই তখন দেখা যায় না। ঐ সব জায়গায় ঠিক দুপুরবেলার কাঠির

ছায়া সারা বছর কিভাবে পড়ে, ছবিতে তাই দেখান হয়েছে। তারপর পৃথিবী যতই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে, ছায়ার দৈর্ঘ্য প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়তে থাকে। ৭ই পৌষ দুপুর বেলা ঐ ছায়া সবচেয়ে বেশী দীর্ঘ হয়। সূর্যের গতিপথ যতদিন দক্ষিণদিকে দূরে সরে যেতে থাকে ছায়া উত্তরদিকে ততদিন এইরকম বড় হতে থাকে। এজন্য ৭ই আষাঢ়ের পর থেকে ৭ই পৌষ পর্যন্ত সূর্যের গতিকে **দক্ষিণায়ন** বা দক্ষিণ গতি বলে। ৭ই পৌষের পর প্রতিদিন ছায়া ছোট হতে থাকে।



মধ্যদিনের ছায়ার রেখাচিত্র

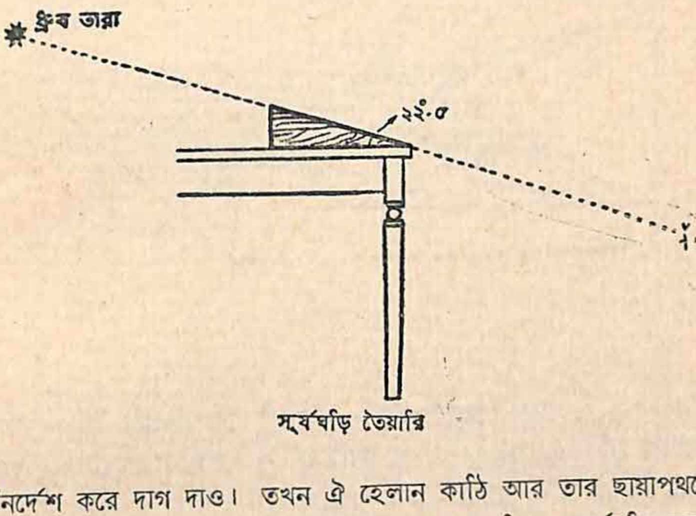
৭ই আষাঢ় আর ছায়া দেখা যায় না। ৭ই পৌষের পর হতে সূর্যের গতিকে **উত্তরায়ণ** বা উত্তর গতি বলে।

তোমরা যে যেখানে থাক সেখানে ছায়াকাঠি নিয়ে পরীক্ষা করে সারা বছরের ঠিক দুপুর বেলার ছায়ার ছবি আঁকবে।

সূর্যঘড়ি : ছায়াকাঠি দিয়ে কোন একদিনের ছায়াপথ এঁকে নিলে পরে এর সাহায্যে মাত্র দুচারদিন সময় ঠিক করা যায়। তারপর আর কাজে লাগে না, কেননা অনেক বদল হয়। একটা কাঠির ছায়াপথ একবার ঠিক করে তা দিয়ে যদি সবদিন সময় ঠিক করা যায়, তবেই সেটা ঘড়ির মতো কাজ দেবে।

পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে যেখানেই থাকুক না কেন, তার মেরুরেখা সব সময়ই ধ্রুবতারার দিকে থাকে। পৃথিবীর উপর যদি একটা ছায়া-কাঠি এমনভাবে বসান যায় যে সেটা ধ্রুবতারার সঙ্গে একরেখায় থাকে, তবে পৃথিবী ঘোরা সত্ত্বেও কাঠির ছায়া সবসময়ই একপথ দিয়ে চলবে।

একটা খোলা জায়গায় একটা কাঠি উত্তর দিকে হেলিয়ে ধ্রুবতারার সঙ্গে এক লাইনে বা একরেখায় রেখে পুঁতে ফেল বা আটকে দাও। একটা ঘড়ি নিয়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঐ কাঠির ছায়াপথের উপর সময়



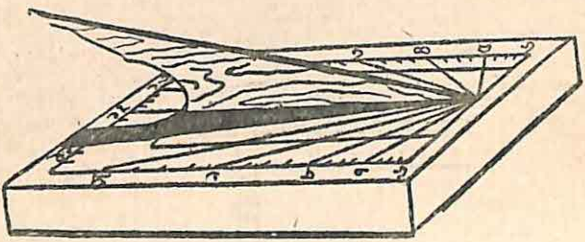
সূর্যঘড়ি তৈয়ারি

নির্দেশ করে দাগ দাও। তখন ঐ হেলান কাঠি আর তার ছায়াপথকে সর্বদিনই ঘড়ির মতো ব্যবহার করা যাবে। এরকম ঘড়িকে **সূর্যঘড়ি** বলে। এখন যেসব ঘড়ি ব্যবহার করা হয়, তার আবিষ্কারের আগে অনেক দেশেই সূর্যঘড়ি ব্যবহার করা হত। সম্ভব হলে এরকম একটা ঘড়ি তোমরা তৈরি কর।

একটা চৌকা কাঠের উপর পাতলা তক্তার একটা কাঠি ধ্রুবতারার দিকে মুখ করে হেলানভাবে বসাতে হবে। সেজন্যে প্রথমে একটা তিন-

৩

কোণা কাঠের টুকরো, ছবিতে যেমন দেখান হয়েছে, সেভাবে টেবিলের উপর রেখে পেছন থেকে তাকিয়ে দেখ ঐ কাঠির উপরের দিকটা আকাশে ধ্রুবতারার সঙ্গে এক রেখায় আছে কি না। এজন্যে কাঠির পেছনের দিকের কোণটা দরকার মতো ছোটবড় করতে হবে। অবশ্য এ কাজ রাত্রে ধ্রুবতারা দেখে করতে হবে। ধ্রুবতারা প্রত্যেক জায়গায় আকাশে কত উঁচুতে আছে সেটা জানা আছে। কোণ যেভাবে মাপা হয় সেইভাবে এই মাপ করা আছে; আর কোণের মাপ ডিগ্রিতেই প্রকাশ করা হয়।

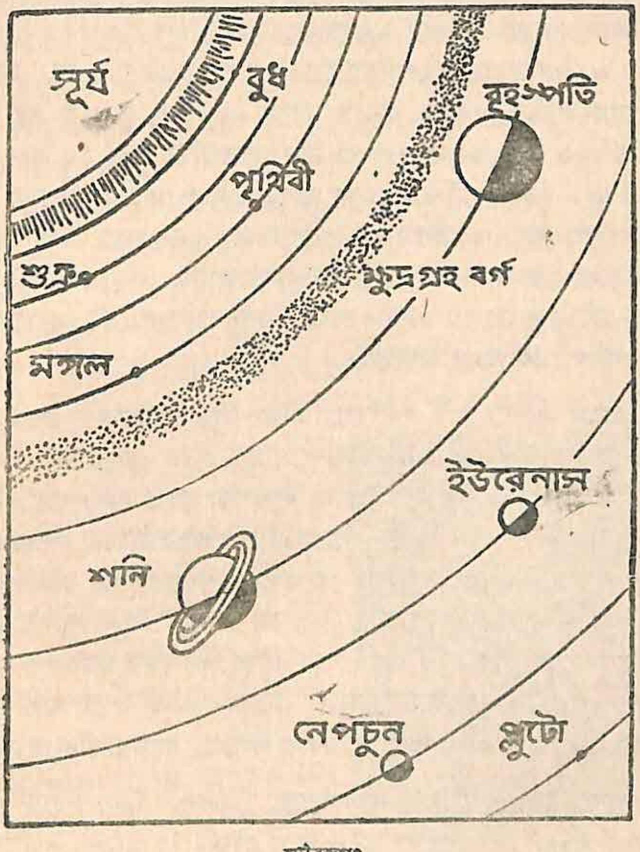


সূর্যঘড়ি

কলকাতায় ধ্রুবতারা প্রায় ২২·৫ ডিগ্রি উপরে আছে। চাঁদা দিয়ে তোমরা ঠিক ঐ কোণের একটা কাঠি তৈরি কর। তারপর স্ক্রু দিয়ে সেটা নিচের চৌকা কাঠের সঙ্গে এঁটে দাও। তারপর ঐ যন্ত্রটা খোলা জায়গায় রেখে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত প্রতি পনের মিনিট পর পর চৌকা কাঠটার উপর ছায়ার মাথায় দাগ দাও। যন্ত্রটা এখন সারাবছর ঘড়ির মতো ব্যবহার করা যাবে।

সৌরজগৎ : এ কথা বলা হয়েছে যে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এইজন্যে পৃথিবীকে সূর্যের গ্রহ বলে। পৃথিবীর মত আর কয়েকটা গ্রহ সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ হল বুধ,

তারপর শুক্র, তারপর পৃথিবী। পৃথিবীর পর মঙ্গল, তারপর অনেক ছোট ছোট গ্রহ বা ক্ষুদ্র গ্রহবর্গ, তারপর বৃহস্পতি। বৃহস্পতির পর



সৌরজগৎ

আরও চারটে গ্রহ রয়েছে—শনি, ইউরেনাস, নেপচুন আর প্লুটো। ছবিতে সূর্য আর গ্রহগুলির চেহারা আর তারা পর পর যেমন আছে

তাই দেখান হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর পরে এদের মধ্যে দূরত্ব এত বেশী যে তা এই ছবিতে ঠিকমতো দেখান যায়নি।

গ্রহদের মধ্যে আয়তনে বুধ সবচেয়ে ছোট, আর বৃহস্পতি সবথেকে বড়। সূর্য আয়তনে বৃহস্পতির চেয়েও এক হাজার গুণ বড়। সূর্যের চারদিকে বুধের একবার ঘুরতে লাগে ৮৮ দিন, শুক্রের ৭½ মাস, পৃথিবীর ১ বছর, মঙ্গলের ৬৮৭ দিন, বৃহস্পতির প্রায় ১২ বছর আর শনির ৩০ বছর। পৃথিবী থেকে আরও দূরের গ্রহদের ঘোরবার সময় বেড়ে বেড়ে প্লুটোর বেলায় এই সময় হয়েছে ২৪৮ বছর। এই গ্রহদের নিয়েই সূর্যের সংসার। একেই বলে **সৌরজগৎ**। এরমধ্যে একটা কথা আছে—সূর্যের নিজের আলো আছে, কিন্তু গ্রহদের নেই, সূর্যের ধার করা আলোতেই তারা উজ্জ্বল।

তারা: সন্ধ্যের পর আকাশের দিকে তাকালে অসংখ্য ছোট ছোট আলোর টুকরোয় আকাশটা ভরতি বলে মনে হয়। এদের প্রায় সকলেই **তারা** বা **নক্ষত্র**। এদের মধ্যে অবশ্য দু-একটা গ্রহও দেখা যায়। তারাগুলো মিটমিট করে আলো দেয়, কিন্তু গ্রহদের আলো স্থির। তারাগুলো সৌর জগতের সব থেকে দূরের গ্রহ থেকেও অনেক দূরে রয়েছে; আর এই তারারা আয়তনেও বিরাট্। অত বড় যে সূর্য, তার থেকেও অনেক অনেক বড়। খুবই দূরে আছে বলে এদের এত ছোট দেখায়। সূর্যের মতো এরাও নিজেরা আলো দেয়। নিজের আলো আছে বলে সূর্যও একটা তারা আর এই সূর্যই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের তারা।

তারা দেখা: পৃথিবীর সবদিকেই আকাশ আর তাতে রয়েছে অসংখ্য তারা। তারাগুলো কিন্তু ঘুরে বেড়ায় না গ্রহদের মতো; এরা স্থির। আমরা সব সময়ই আকাশের অর্ধেকটা দেখি, বাকী অর্ধেকটা থাকে পৃথিবীর অপর দিকে। পৃথিবী দিনরাত নিজের অক্ষরেখায় ঘুরছে; এজন্যই আকাশের সবটা আমরা দেখতে পাই। দিনের বেলাতেও

তারারা আকাশে থাকে তবে সূর্যের প্রখর আলোর জন্যে তাদের দেখতে পাওয়া যায় না।

রাত ৯টার সময়ে একদিন আকাশের কয়েকটা বিশেষ তারা লক্ষ্য কর। ১৫ দিন পরে দেখবে ঐ তারাগুলি একঘণ্টা আগে অর্থাৎ সন্ধ্যে ৮টায় আগের যে জায়গায় তাদের দেখেছিলে সেইখানে এসেছে। একমাস পরে দেখবে ২ ঘণ্টা আগে অর্থাৎ সন্ধ্যে ৭টাতে তারাগুলি আগের জায়গাতে এসে গেছে। এভাবে ৬ মাস পরে কি হবে? এখন যেসব তারা সন্ধ্যের সময় পৃথিবীর উল্টো দিকে রয়েছে, ৬ মাস পরে তারা সন্ধ্যের সময় আমাদের মাথার উপর আসবে। আগে যাদের দেখা যেত না, এখন তাদের দেখা যাবে। পৃথিবীর যে বার্ষিক গতি তার জন্য একই তারাদের আকাশের বিভিন্ন জায়গায় দেখা যায়। আজ যে তারা আকাশে দেখা যাচ্ছে কিছুদিন বাদে হয়ত তাদের আর দেখতে পাবে না। এবার কয়েকটা বিশেষ বিশেষ তারা আকাশে দেখে তাদের ছবি আঁক আর বিবরণ লিখে রাখ।

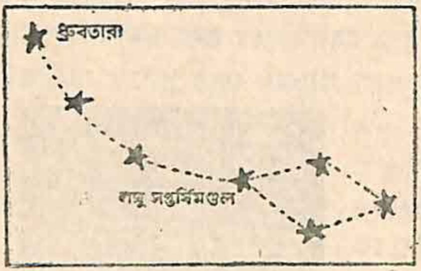


সপ্তর্ষিমণ্ডল ও ধ্রুবতারা

সপ্তর্ষিমণ্ডল আর ধ্রুবতারা : এদের কথা আগেই বলা হয়েছে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে উত্তর দিকের আকাশে ৭টা উজ্জ্বল তারা পর পর দেখা যায়—তাদের একসঙ্গে দেখলে মনে হয় একটা লাঙল বা ইংরেজী প্রশ্ন চিহ্নের (?) মতো। এদের বলা হয় **সপ্তর্ষিমণ্ডল**। এর এক কিনারায় যে দুটো তারা দিয়ে লাঙলের ফাল তৈরী হয়েছে মনে হয়, ঐ দুটো তারাকে একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ

দেওয়া যায়, ঐ রেখা আকাশের আর একটা তারার খুবই কাছ দিয়ে যাবে। রাত যতই বাড়বে সপ্তর্ষিমণ্ডল ততই আকাশে সরে সরে যেতে থাকবে। কিন্তু ঐ শেষ তারা দুটোর মধ্যে যে রেখা কল্পনা করা হয়েছে সেটা সব সময়েই উত্তর দিকের আকাশের ঐ তারাটার খুব কাছ দিয়েই যাবে। অন্য তারাদের মতো এই তারাটার উদয় বা অস্ত নেই। একই জায়গায় একে সব সময় দেখা যায়। এইজন্যই একে **ধ্রুবতারা** বলে। পৃথিবীর মেরুরেখা সব সময়ই এই ধ্রুবতারার দিকে প্রসারিত। আগে জাহাজ চালাবার সময় এই তারা দেখেই উত্তর দিক্ ঠিক করা হত।

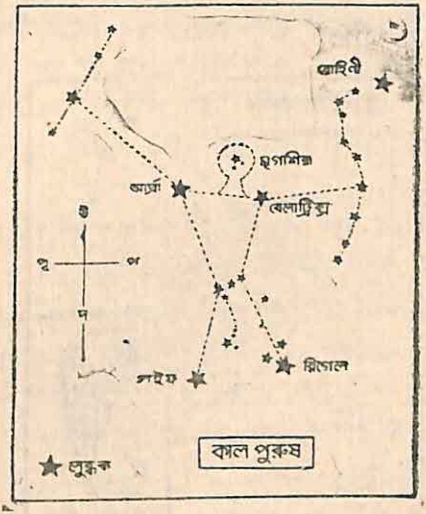
লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল : ধ্রুবতারার কাছাকাছি আরও ৬টা নক্ষত্র দেখা যায়। ধ্রুবতারাকে নিয়ে এই ৭টা তারাকে একসঙ্গে লঘু **সপ্তর্ষিমণ্ডল** বলে। এর একদিকের চারটে নক্ষত্রকে কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে একটা রুইতনের মতো দেখায়।



লঘু সপ্তর্ষিমণ্ডল

কালপুরুষ : শীতকালে সন্ধ্যেবেলায় পূর্বদিকের আকাশে কয়েকটা উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এগুলিকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের আকাশে দেখতে পাবে। নক্ষত্রগুলো কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে এক মস্ত শিকারী বা যোদ্ধার মতো দেখায়। ছবিতে দেখ কোন্ কোন্ নক্ষত্র এই 'যোদ্ধার' কোথায় কোথায় আছে। 'যোদ্ধার' যেন ডানহাতে তীর, কোমরে বেল্ট, তাতে একটা তরোয়াল ঝুলছে। ডানপায়ের দক্ষিণ-পূর্বদিকে বেশ বড় একটা তারা জ্বলজ্বল করছে দেখা যায়। এই উজ্জ্বল তারাটির নাম লুব্ধক। একে বলা হয় শিকারী কালপুরুষের কুকুর।

বৃশ্চিকমণ্ডল : আষাঢ় মাসে সন্ধ্যের সময় দক্ষিণদিকের আকাশের উপর দিকে কয়েকটা বেশ উজ্জ্বল নক্ষত্র দেখা যায়। এগুলিকে একটা কাল্পনিক রেখা দিয়ে যোগ করলে একটা বড় বিছের মতো মনে হয়। এজন্যে এই তারাগুলিকে বলা হয় **বৃশ্চিকমণ্ডল**। এই কাল্পনিক বিছের মাথার উপর একজোড়া শুঁড় কল্পনা করা যায়। জ্যেষ্ঠা এই মণ্ডলের



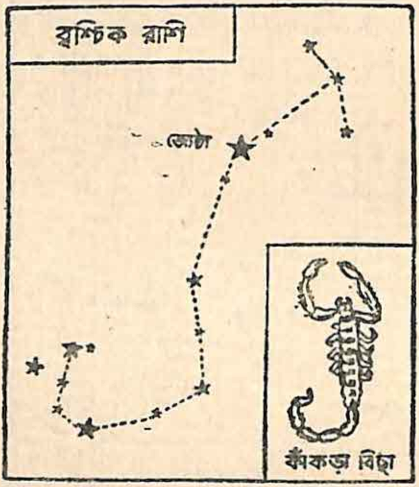
কালপুরুষ

একটা বড় লালরঙের তারা। এর মতো বড় তারা কম দেখা যায়। তাই একে বলা হয় দানব-নক্ষত্র।

যে যে তারার ছবি দেওয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে আকাশের তারাদের মিলিয়ে দেখতে হলে ছবিটা (যেমন ধর কালপুরুষের ছবি) মাথার উপর তুলে ধরে দেখতে হবে। মনে করা যেতে পারে কালপুরুষ যেন আকাশ থেকে উপুড় হয়ে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে।

গ্রহ : বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে আকাশের একই জায়গায় একই তারা এসে থাকে। তারার ছবি দেখে আকাশে এদের চেনা অনেকটা সহজ; কিন্তু গ্রহগুলি সূর্যের চারদিকে ঘোরে বলে অনবরত জায়গা বদল করে। এজন্যে কোন গ্রহ প্রতিবছর একই সময় একই জায়গায় থাকে না।

গ্রহ আর তারার মধ্যে তফাত বোঝার সহজ উপায় আছে। তারাগুলো মিটমিট করে আলো দেয়, আর গ্রহের আলো স্থির। দূরবীন



বৃশ্চিকমণ্ডল

দিয়ে দেখলে গ্রহগুলিকে দেখা যায় গোলাকার, কিন্তু তারাগুলিকে দেখায় ছোট আলোর ফোঁটার মতো। তারাগুলির পরস্পরের দূরত্ব সব সময় একই থাকে, কিন্তু গ্রহদের বেলায় তা থাকে না।

বুধ আর শুক্র : বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছে থেকে তার চারদিকে ঘুরছে। সূর্যের কাছে সব সময় থাকে বলে সূর্য অস্ত যাবার বেশীক্ষণ

পরে বুধকে আর দেখা যায় না। দিনের বেলা সূর্যের আলোর জন্যও একে দেখা যায় না। কাজেই একে সন্ধ্যের সময় সূর্য অস্ত যাবার ঠিক পরেই পশ্চিমের আকাশে বা সূর্য উঠবার আগে পূর্বদিকের আকাশে অল্প সময়ের জন্য দেখা যায়।

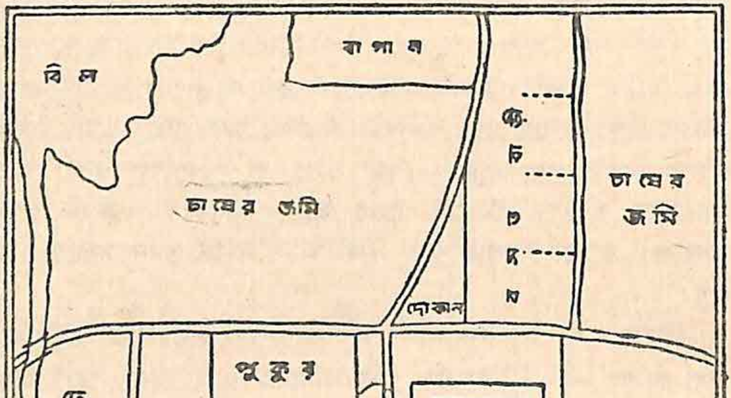
বুধের পরেই শুক্র। শুক্রের আয়তন বুধের প্রায় ১৫ গুণ, পৃথিবীর প্রায় সমান। শুক্রই পৃথিবীর সবথেকে কাছের গ্রহ। বুধের মতো একই কারণে এদের সন্ধ্যের সময় আর সকাল বেলা দেখা যায়। অবশ্য বুধের চাইতে বেশী সময় শুক্রকে ভোর রাতে বা সন্ধ্যেবেলা দেখা যায়। আকাশের সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধক থেকেও শুক্রগ্রহ বেশী উজ্জ্বল। শুক্রকে বিকালবেলা, সূর্য অস্ত যাচ্ছে এমন সময়ও দেখা যায়।

মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনি : বুধ আর শুক্র ছাড়া বাকী গ্রহগুলির মধ্যে কেবল মঙ্গল, বৃহস্পতি আর শনিকেই খালি চোখে দেখা যায়। গ্রহগুলি কোন্ সময় আকাশের কোন্ জায়গায় দেখা যেতে পারে সেটা বাংলা পাঁজিতে লেখা থাকে। অনেক সময় খবরের কাগজেও গ্রহ আর তারা আকাশে কিভাবে আছে তা দেখিয়ে ছবি ছাপা হয়।

মঙ্গলগ্রহ আকারে পৃথিবী থেকে কিছু ছোট, আর শুক্র গ্রহের থেকে অনেক কম উজ্জ্বল; চেহারা লালচে। বৃহস্পতি সব থেকে বড় গ্রহ; আয়তনে পৃথিবীর ১৩শ গুণ। আকাশে বৃহস্পতিকে বেশ উজ্জ্বল দেখা যায়। বৃহস্পতির পরই শনি। শনিকে বেশ বড় তারার মতো দেখা যায়; তিনটে বলয় শনিকে মালার মতো ঘিরে রেখেছে। টেলিস্কোপ বা দূরবীন যন্ত্র দিয়ে গ্রহগুলিকে ভাল দেখা যায়। শনির এই মালার মতো বলয়ও দূরবীন দিয়ে দেখা যায়। চন্দ্রের উপরের চেহারা, গর্ত ইত্যাদিও দূরবীন দিয়ে খুব ভালভাবে লক্ষ্য করা যায়।

স্কুল আর আশপাশের জায়গায় জরিপ আর নকশা : তোমরা জেনেছ কি করে বাড়ি থেকে স্কুলে যাবার রাস্তার আর রাস্তার দুপাশের বাড়ি,

বাগান ইত্যাদির নকশা আঁকতে হয়। এবার তোমাদের নিজেদের স্কুলের আর তার পাশের জায়গার নকশা আঁকতে হবে। এর জন্যে স্কুলের কাছাকাছি খেলার মাঠ, রাস্তা-ঘাট, বাড়িঘর, বাগান, চাষের জমি ইত্যাদি



কোন্ দিকে কিভাবে কত জায়গা জুড়ে আছে, তার মাপজোখ করে ঠিক করতে হবে। স্কুলের যাবার পথের নকশা আঁকার জন্য তোমরা পা ফেলে ফেলে গুনে দেখেছিলে, পথের এক একটা সোজা ভাগ কত পা লম্বা।

এবারেও সেইভাবে দূরত্ব মাপতে পার। পায়ের মাপ কত জানার পর সেটা কত ফুট বা মিটার হল তা বার করা দরকার। এর জন্য ১০ পা ফেলে কতটা জায়গা যেতে পার সেটা ফিতে দিয়ে মাপ। সেই মাপ যদি ১৫ ফুট হয় তাহলে তোমার এক পা হল ১·৫ ফুটের বা দেড় ফুটের সমান। এখন যে কোন পথ কতখানি লম্বা তা ফুটে প্রকাশ করতে পার।

আরও ভালভাবে দূরত্ব মাপতে হলে দাগকাটা লম্বা ফিতে বা বাঁশের কাঠি ব্যবহার করতে হয়। একটা কাঠি ৪ হাত বা ৬ ফুট লম্বা করলেই সুবিধে হবে। মোটামুটি দিক্ ঠিক করার জন্যে পকেট কম্পাস ব্যবহার করতে পার। নানা জায়গার মাপ, দিক্ ইত্যাদি নোট বইয়ে লিখে নিতে হবে। তারপর সুবিধে মতো স্কেল ঠিক করে স্কুলের চারপাশে গ্রামের যেসব অংশ, মাঠ ইত্যাদি রয়েছে তার নকশা আঁক।

মানচিত্র : সরকারী লোকেরা গ্রাম, থানা ইত্যাদির নকশা তৈরি করেন। বিভিন্ন থানার নকশা এক সঙ্গে মিলিয়ে একটা জেলার নকশা হয়। এই নকশাকে জেলার মানচিত্র বলে। নানা চিহ্ন দিয়ে মানচিত্রে শুধু নকশা ছাড়াও অনেক জিনিস দেখান হয়—যেমন, গ্রাম, পোস্ট অফিস, বাজার, থানা, নানারকমের রাস্তা, বন, পাহাড়, খাল, বিল, নদী, সমুদ্র ইত্যাদি। আরও বড় জায়গায় যেমন রাজ্যের মানচিত্রে, এই বিষয় ছাড়াও জেলার সীমারেখা দেখান হয়। বিশেষ রকম মানচিত্রে কোন্ জায়গা কত উঁচুনিচু, কোথায় কোন্ জিনিসের চাষ হচ্ছে, নানারকমের খনি বা খনিজাত জিনিস ইত্যাদি দেখান হয়।

উত্তর লেখ

১। স্কুলের মাঠে একটা ছায়াকাঠি বসাও। কোনও এক মাসে প্রতিদিন ঠিক দুপুরবেলার ছায়া মাপ। তোমার স্কুলের আর এক বন্ধুর এই একই কাজ, আর তোমার নিজের কাজের তুলনা কর।

২। সূর্যঘড়ি কাকে বলে? সূর্যঘড়ি তৈরি করতে কি কি অসুবিধা হয়েছে লেখ।

৩। সৌরজগৎ কাকে বলে ছবি এঁকে বোঝাও।

৪। গ্রহ আর তারার মধ্যে তফাত কি? আকাশে গ্রহ আর তারা কিভাবে চিনবে?

৫। নিচের নক্ষত্রগুলির বিবরণ ছবি এঁকে দেখাও:—

(ক) সপ্তর্ষিমণ্ডল, (খ) কালপুরুষ ও (গ) বৃশ্চিকমণ্ডল।

৬। কোনও একটা জায়গার নকশা কিভাবে তৈরি করা যায়? তোমরা কয়েক-জন মিলে তোমাদের মহল্লায় বা পাড়ার নকশা তৈরি কর।

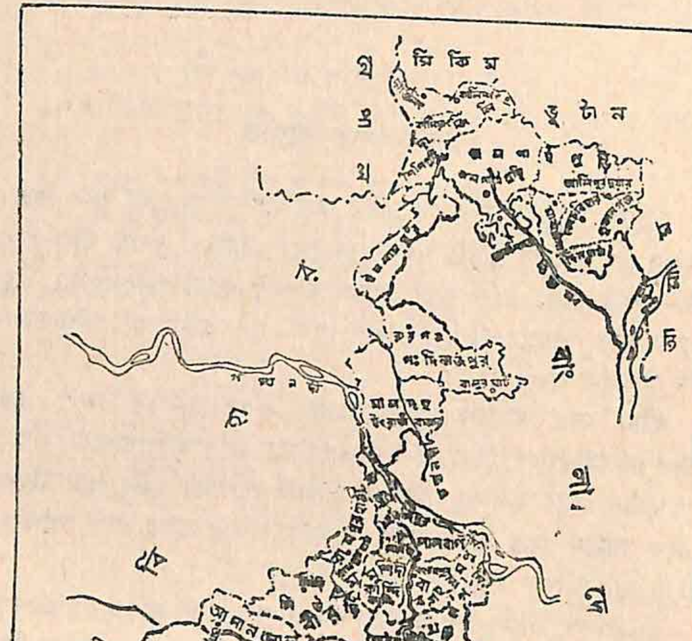
৪

পশ্চিমবঙ্গের ভূগোল

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারত আর পাকিস্তান একই দেশ ছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ই অগস্ট ভারতবর্ষ আলাদা রাষ্ট্রে ভাগ হয়ে যায়—একটি ভারত বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র আর একটি পাকিস্তান। এই ভাগের সময় বাংলাদেশও দুটি ভাগে বিভক্ত হয়—একটি হয় পশ্চিমবঙ্গ আর অপরটি বাংলা দেশ।

সীমা আর আয়তন : পশ্চিমবঙ্গের রঙিন মানচিত্র দেখ। এর উত্তরে রয়েছে বিরাট্ হিমালয় পর্বতের কিছু অংশ যার ভেতরে সিকিম আর ভুটান রাজ্য, তাছাড়া দার্জিলিং জেলার অনেকটা অংশ, পূর্ব দিকে রয়েছে আসাম আর বাংলা দেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আর পশ্চিমে বিহার আর উড়িষ্যা রাজ্য।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ ভাগ হবার সময় সমস্ত বাংলাদেশের ⅓ ভাগের কিছুটা বেশী অংশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গঠিত হয়। এর পরে কোচবিহার, চন্দননগর, বিহারের পুরুলিয়া আর পূর্ণিয়া জেলার খানিকটা অঞ্চল যুক্ত হয়। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের সেন্সাস অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের আয়তন প্রায় ৩৩,৮২৯ বর্গ মাইল। উত্তরে দার্জিলিং জেলার উত্তর দিক্ থেকে দক্ষিণে চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ দিক্ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ বিস্তৃত। পশ্চিমবঙ্গের দৈর্ঘ্য প্রায় ৩৮৭ মাইল। পশ্চিমবঙ্গ সবথেকে চওড়া কোন্‌খানে জান? পুরুলিয়া জেলার পশ্চিম সীমান্ত থেকে চব্বিশ পরগনা জেলার পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ ১৯৮ মাইল প্রস্থ। এক এক জায়গায়, যেমন পশ্চিম দিনাজপুরের কোন কোন জায়গায় খুব সরু, প্রস্থে মাত্র ছয়-সাত মাইল।


সিকিম
ভুটান
মালদহ
আসানসোল
পুরুলিয়া
বাঁকুড়া
বিষ্ণুপুর
উড়িষ্যা
বঙ্গোপসাগর

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী : ভূপৃষ্ঠের গঠন যেমন উঁচু পাহাড়, পর্বত, উঁচু বা নিচু জায়গা ইত্যাদির দিক্ দিয়ে এই রাজ্যকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন :

(১) **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল বা পাহাড়ে জায়গা**—দার্জিলিং জেলার বেশির ভাগ আর জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরের সামান্য অংশ উত্তর দিকে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে। এই অঞ্চলের নিচে খুব ঘন বনভূমি বা জঙ্গল। এই উঁচু পাহাড়ে জায়গা ক্রমশ নিচু হয়ে দক্ষিণদিকের সামান্য উঁচু সমভূমিতে মিশেছে।

মহানন্দা, তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা ইত্যাদি কয়েকটা নদী হিমালায় পর্বত থেকে বেরিয়ে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ভাগের উপর দিয়ে। এদের গতিপথ দেখে জমি কোন্ দিকে উঁচু বা নিচু তা খানিকটা বুঝা যায়।

(২) **পশ্চিমের কাঁকুরে মাটির উঁচুনিচু জমি**—বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া আর মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম ভাগ আর পুরুলিয়া জেলার অনেক জায়গাই উঁচুনিচু। এইসব জায়গার মাটি মাঝে মাঝে লাল আর কাঁকুরে। ফলে চাষবাসের পক্ষে ভাল নয়। বাঁকুড়া আর মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম দিকে আর পুরুলিয়া জেলার মধ্যভাগ বরাবর ছোট ছোট পাহাড় আছে। ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, রূপনারায়ণ, কংসাবতী, হলদি, সুবর্ণরেখা ইত্যাদি নদী পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূর্বের নিচু ঢাল বেয়ে নেমে গেছে।

(৩) **দক্ষিণের নিচু জমি**—বঙ্গোপসাগরের ধারে চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণ ভাগের সুন্দরবন আর মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণে সমুদ্রের ধারের জায়গা খুব নিচু। এইসব জায়গায় জমি এত নিচু যে জোয়ারের সময় অনেক জায়গা জলে ডুবে যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে অনেক নদ-নদী আর তাদের শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এদের মধ্যে যেগুলি

বঙ্গোপসাগরে পড়ে বড় বড় মোহানার সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে মাতলা, হাড়িয়াডাঙ্গা ইত্যাদি প্রধান।

(৪) **মধ্যভাগের সমতল জায়গা**—আগে যে তিনটি অঞ্চলের কথা লেখা হয়েছে সেই তিন অঞ্চলের মধ্যে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের বাকী সমস্ত জায়গাই সমতল। মালদহ আর মুর্শিদাবাদ জেলার সমভূমির মধ্য দিয়ে গঙ্গানদী উত্তর-পশ্চিম দিক্ থেকে এসে কিছুদূর চলার পর দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। গঙ্গার এক শাখা ভাগীরথী নামে দক্ষিণ দিকে বয়ে চলেছে, আর প্রধান শাখা পদ্মা নাম নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে বাংলা দেশে ঢুকেছে। গঙ্গার উত্তর দিকে যে সমভূমি অঞ্চল রয়েছে তাতে দার্জিলিং জেলার দক্ষিণ দিকের সমভূমি আর জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ জেলা। গঙ্গার দক্ষিণ দিকের সমতলভূমি অঞ্চলে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া জেলা আর বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনা জেলার সমভূমি অঞ্চলগুলি।

ভাগীরথী নদীর নিচের দিকের অংশের নাম হুগলী নদী। হুগলী নদীর পশ্চিম দিকে যত যাওয়া যায় জমি তত উঁচু হতে থাকে। পশ্চিমের এই উঁচু অঞ্চল থেকে দ্বারকেশ্বর, ময়ূরাক্ষী ইত্যাদি নদী ভাগীরথী নদীতে এসে পড়েছে। মধ্যভাগের সমতল জায়গার বেশির ভাগই গড়ে উঠেছে গঙ্গা আর ভাগীরথী নদীর পলিমাটি দিয়ে। অবশ্য পশ্চিম দিকের নদীগুলিও এই কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

জলবায়ু: চৈত্র মাস থেকে সূর্যের গতিপথ বিষুবরেখার উপর থেকে সরে সরে কর্কটক্রান্তি রেখার দিকে যেতে থাকে। আগেই কর্কটক্রান্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই রেখা পশ্চিমবঙ্গের প্রায় মাঝামাঝি জায়গার উপর দিয়ে গিয়েছে। কাজেই বৈশাখ থেকে শ্রাবণ পর্যন্ত সূর্য মাথার উপর থাকার দরুন পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া খুবই গরম হবার কথা। কিন্তু অতটা গরম আমরা বোধ করি না কেননা দক্ষিণ

দিকে সমুদ্র থাকায় বঙ্গোপসাগর থেকে জলো হাওয়া আসে। চৈত্র-বৈশাখ মাসে সন্ধ্যের দিকে দক্ষিণে হাওয়ার কথা তোমরা অনেকেই হয়ত জান। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ থেকে জলো হাওয়া অনবরত আসতে থাকে আর তার জন্য বাংলাদেশে ঐ সময় প্রচুর বৃষ্টি হয় আর গরমও অনেক কমে যায়। বৈশাখ মাসেও কিছু কিছু বৃষ্টি হয় তবে তা বেশির ভাগই ঝড়ের সঙ্গে হয়। আষাঢ় মাসে বর্ষার শুরু, আর শ্রাবণে সব থেকে বেশী বৃষ্টি হয়।

হিমালয় অঞ্চলে আর পাহাড়ের নিচের দিকের জায়গায়, যেমন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি আর কোচবিহার জেলায় বৃষ্টি সবথেকে বেশী পরিমাণে হয়—বছরে প্রায় ১০০ থেকে ১৪০ ইঞ্চি। দার্জিলিং শহর বেশী উঁচুতে বলে ঐ জায়গার জলবায়ু খুব ঠাণ্ডা। পশ্চিম দিনাজপুরে, কলকাতা আর চব্বিশ পরগনার উত্তর দিকে বৃষ্টিপাত হয় বছরে ৬০ থেকে ৭০ ইঞ্চি; সুন্দরবন অঞ্চলে বৃষ্টি প্রায় ১০০ ইঞ্চির মতো হয়। মালদহ, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, হাওড়া, হুগলী জেলায় আর মেদিনীপুর, বর্ধমান জেলার পূর্বদিকে বৃষ্টি হয় মাঝামাঝি রকমের, বছরে প্রায় ৬০ ইঞ্চি। এইসব জায়গায় গরম বা ঠাণ্ডা কোনটাই বেশী নয়। বর্ধমান আর মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমদিকে, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া জেলায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ আরও কম—বছরে ৫০ থেকে ৬০ ইঞ্চি। এইসব জায়গার হাওয়া বেশ শুকনো; শীতের সময় ঠাণ্ডা যেমন বেশী, গ্রীষ্মের সময় গরমও তেমনি বেশী। মোটের উপর পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ জায়গার জলবায়ু গরম আর ভিজে। ঋতু পরিবর্তন হওয়ার ফলে বছরের সব সময়ে জলবায়ু একই রকম—শুকনো বা ভিজে, গরম বা ঠাণ্ডা থাকে না।

বন-জঙ্গল : বন-জঙ্গল কেটে মানুষ বসতি করে। তোমরা জান যে মানুষের জীবনে বন-জঙ্গলের বিশেষ প্রয়োজন আছে, বাড়িঘর, আসবাবপত্র, গাড়ি ইত্যাদি তৈরির আর জ্বালানির জন্য কাঠের দরকার।

দার্জিলিংয়ের উ'চু পাহাড়ে জায়গায় ওক, পাইন ইত্যাদির বন রয়েছে। এদের নরম কাঠ থেকে দিয়াশলাই তৈরী হয়। দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ি জেলায় পাহাড়ের তলার দিকের জায়গায় শাল, শিশু, জারুল, বাঁশ, বেত ইত্যাদির গভীর বন রয়েছে। শাল আর শিশু কাঠ দিয়ে ঘরবাড়ি, নৌকা, আসবাবপত্র ইত্যাদি তৈরী হয়। সুন্দরবনের দক্ষিণ দিকের বনে গরান, ও নানারকমের জ্বালানি কাঠের গাছ ও বেত রয়েছে। আগে প্রচুর সুন্দরী গাছও ছিল এখন কম দেখা যায়। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম জেলার পশ্চিমদিকে আর পুরুলিয়া জেলার জায়গায় জায়গায় শাল, শিশু আর মহুয়া গাছের বন আছে। পশ্চিমবঙ্গে যতটা বন-জঙ্গল থাকা দরকার তার থেকে অনেক কম রয়েছে।

চাষের জিনিস : আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মাটি বেশ ভাল ফসল হবার উপযোগী; তাছাড়া বেশির ভাগ জায়গায় বৃষ্টি ভালই হয়; ফলে ফল-ফসলও নানারকম হয়।

ধান—পশ্চিমবঙ্গে ধানের চাষই বেশী হয়। চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান, মেদিনীপুর আর পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় প্রচুর ধান হয়। পশ্চিমবঙ্গে লোকও অনেক—সেইজন্য ধান প্রচুর হলেও লোকসংখ্যার তুলনায় তা যথেষ্ট নয়। বর্ষার সময় আমন ধানের চাষ হয়, আর বসন্তকালে যে ধানের বীজ পোঁতা হয় তাকে বলে আউশ। পশ্চিমদিকের কয়েকটা জেলায় বছরে মাত্র একবার আমন ধানের চাষ হয়; এর কারণ জমি খুব ভাল নয়, তাছাড়া জলেরও অভাব, জলসেচ করে যদি বেশির ভাগ জমিতে আমন আর আউশ দু'রকম ধানই চাষ করা যায় তাহলে খানিকটা অভাব মিটতে পারে। আর এক রকমের ধান আছে, যেসব ধান খুব নিচু জমিতে জন্মায়। একে বলা হয় বোরো। পৌষমাসে বীজ ছড়ান হয়। শীতকালে জলের ভাল বন্দোবস্ত না থাকলে এ ধান হবে না।

পাট—আমাদের এখানে ধানের পর পাট চাষ প্রধান। পাটের জন্যও প্রচুর জলের দরকার। কিন্তু জন্মাবার সময় পাট গাছের গোড়ায় জল জমে থাকলে পাট ভাল হয় না। উত্তর আর পশ্চিম দিকের পাহাড়ে আর উঁচুনিচু জায়গা ছাড়া প্রায় অন্য সব জায়গাতেই পাট-চাষ হয়। পাট থেকে চট, থলি ইত্যাদি বহু দরকারী জিনিস বড় বড় পাটকলে তৈরী হয়। এইসব জিনিস বিদেশে চালান দিয়ে অনেক টাকা বিদেশ থেকে আসে।

রবিশস্য—যেসব শস্য শীতের গোড়ার দিকে চাষ করে বসন্তকালে সংগ্রহ করা হয় তাদের রবিশস্য বলে; যেমন গম, যব, কলাই, সরষে, আলু ইত্যাদি। মুর্শিদাবাদ, মালদহ, বীরভূম আর বাঁকুড়া জেলায় গমের চাষ হয়। কিন্তু আমাদের যত পরিমাণ গমের দরকার এ-সব জায়গায় ফলন ততটা হয় না। মালদহ আর মুর্শিদাবাদ জেলায় গম ছাড়া যবেরও চাষ হয়। খেসারি, মসুর, মুগ ইত্যাদি ডাল নদীয়া, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগনা জেলায় চাষ করা হয়। পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ আর জলপাইগুড়ি জেলাতে সরষের চাষ হয়ে থাকে। তেলের জন্যই এসব জায়গায় সরষের চাষ করা হয়। চাল ও গমের মতো ডাল আর সরষেও আমাদের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট হয় না বলে অন্য রাজ্য থেকে আমদানি করতে হয়। হাওড়া আর হুগলী জেলায় প্রচুর আলুর চাষ হয়। ঐ সব জায়গায় বেড়াতে গেলে দেখবে আলু বড় বড় ঠাণ্ডা ঘরের গুদামে রাখা আছে যাতে পচে না যায়।

এসব ছাড়া বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম আর পশ্চিম-দিনাজপুর জেলায় আখ আর দার্জিলিং ও মালদহ জেলায় ভুট্টার চাষ হয়। জলপাইগুড়ি আর কোচবিহার জেলায় যথেষ্ট পরিমাণে তামাকের চাষ হয়। দার্জিলিং আর জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচুর চা জন্মায়। এইসব চা পৃথিবীর নানা দেশে রপ্তানি করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গে আর দুটো বিশেষ দরকারী জিনিস হয়—রেশম আর

গালা। তুঁতগাছের পাতা রেশমের পোকার খাদ্য। রেশম তৈরির জন্য মালদহ আর মুর্শিদাবাদ জেলায় তুঁতগাছের চাষ করা হয়। লাক্ষাকীট বা পোকার দেহ থেকে লাক্ষা তৈরী হয়। বাঁকুড়া আর পুরুলিয়া জেলায় শাল, কুল, পলাশ আর কুসুম গাছে লাক্ষাপোকা পালন করা হয়।

খনির জিনিস : পশ্চিমবঙ্গের প্রধান খনিজ সম্পদ্ কয়লা। মোট কয়লার খনির সংখ্যা ২৫০ এরও বেশী; এর মধ্যে বর্ধমান জেলার রানীগঞ্জে আছে ২৪৪টা খনি। অন্যগুলি বীরভূম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া আর দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে এলাকায়। রানীগঞ্জের দিকে তামা, লোহা, চুনাপাথর আর চীনেমাটি পাওয়া যায়।

জলসেচ : পশ্চিমবঙ্গের সব জায়গাতেই যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টি হয় না। বর্ধমান আর মেদিনীপুর জেলার পশ্চিম ভাগে, বাঁকুড়া আর পুরুলিয়া জেলায় সারা বছর যত বৃষ্টি হয় তা চাষের পক্ষে খুবই কম। একদিকে জলের অভাবে চাষবাস ভাল হয় না, অন্যদিকে নদীগুলি মজে গিয়ে অগভীর হয়ে পড়ায় তাতে বর্ষার জল যথেষ্ট জমে না। এছাড়া গাছ-গাছড়া কেটে ফেলার ফলে মাটিতেও জল বেশী থাকে না। এইসবের ফলে কতকগুলি নদীতে, বিশেষ করে দামোদরে ভয়ানক বন্যা হয়ে খেত-খামার, ফসল, বাড়িঘর, চাষের জমি সব নষ্ট হয়ে যেত। এই বন্যা বন্ধ করা আর সারাবছর ধরে চাষের প্রয়োজনে জল সরবরাহ করার জন্য দামোদর এবং আর কয়েকটা নদীর খাতে বাঁধ দিয়ে বিরাট্ বিরাট্ হ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে জল জমা থাকবে। ঐ জল দরকার মত ছাড়া হয়, আর দুর্গাপুরের কপাট-বাঁধের (ব্যারাজের) সাহায্যে আশে-পাশের ও দূরের চাষের জমিতে খাল আর নালার সাহায্যে জল যোগান দেওয়া হয়। ফলে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী আর হাওড়া জেলায় চাষের বিশেষ সুবিধে হয়েছে। ময়ূরাক্ষী নদী বীরভূম আর মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। এই নদীতেও বাঁধ আর ব্যারাজ তৈরি করে ঐ দুই জেলার জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কংসাবতী নদীতেও বাঁধ দেওয়া হচ্ছে যার ফলে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া আর মেদিনীপুর জেলার লোকেদের বিশেষ উপকার হবে।

শিল্প বা কল-কারখানা : পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মধ্যে বিশেষভাবে শিল্পে উন্নত। শিল্প দু'রকমের—যন্ত্রশিল্প আর কুটির-শিল্প। বড় বড় কারখানায় যন্ত্র দিয়ে নানারকম জিনিস তৈরি করা হয়—এদের বলা হয় যন্ত্রশিল্প। ঘরে ঘরে হাতে বা সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে নানারকমের জিনিস তৈরী হয়—এদের বলা হয় কুটির-শিল্প।

যন্ত্রশিল্প : কলকাতার কাছাকাছি জায়গায়, হুগলী নদীর দুধারে ত্রিবেণী থেকে বজবজ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ মাইল জায়গার মধ্যে প্রচুর কল-কারখানা আছে। আসানসোল—রানীগঞ্জ অঞ্চলেও বেশ কিছু কল-কারখানা আছে। কলকাতার এই শিল্পাঞ্চলে প্রায় ১০০টি **পাটের কল** আছে। প্রচুর পরিমাণে চট, থলে ইত্যাদি এইসব কলে হয় আর হাজার হাজার শ্রমিক এইসব কলে কাজ করে। **কাপড়ের কলের** সংখ্যা এই অঞ্চলে প্রায় তিরিশটি। **সিল্কের কাপড়ের কলও** পশ্চিমবঙ্গে আছে—মুর্শিদাবাদ এই শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। টিটাগড়, কাঁকিনাড়া, নৈহাটি আর রানীগঞ্জে **কাগজের কল** আছে। নদীয়া জেলার পলাশীতে আর বীরভূম জেলার আহমদপুরে **চিনির কল** আছে। কলকাতা আর আশে-পাশের জায়গায় **তেল, ময়দা, সাবান, ওষুধ, দিয়াশলাই, কাচ** আর **চীনেমাটির জিনিস** তৈরি করার কারখানা আছে। পশ্চিমবঙ্গের নানা জায়গায় **ধান ভেনে চাল তৈরি করার কল** আছে। চব্বিশ পরগনা জেলায় বাটানগরে বিরাট্ এক **জুতোর কারখানা** আছে। কলকাতায় এবং আশে-পাশে কাঁচা চামড়া পাকা করার কারখানা আছে। হুগলী জেলার সাহাগঞ্জে **রাবার** আর রাবার থেকে নানারকম জিনিস তৈরির কারখানা রয়েছে। দার্জিলিং আর জলপাইগুড়িতে **চা** তৈরির অনেক কারখানা আছে।

কলকাতা শিল্পাঞ্চলের মতো রানীগঞ্জ, আসানসোল আর দুর্গাপুর

এলাকায় একটা বিরাট্ শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে। রানীগঞ্জের খনি থেকে কয়লা তুলে তা থেকে নানা কাজের উপযোগী জ্বালানি তৈরির জন্য অনেক কারখানা আছে। **বার্নপুরের লোহা আর ইস্পাতের কারখানা** প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি বর্ধমান জেলার দুর্গাপুরে লোহা, ইস্পাত আর **কোক কয়লার চুল্লীর** বিরাট্ কারখানা গড়ে উঠেছে। এখনকার সময়ে লোহা আর ইস্পাত ছাড়া বাড়িঘর, কল-কারখানা, যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় তৈরি করা যায় না। বর্ধমান জেলার চিত্তরঞ্জনে **রেলগাড়ির ইঞ্জিন তৈরি** করার বিরাট্ কারখানা আর কলকাতার কাছে কোন্নগরের পাশেই **মোটর গাড়ি তৈরির** মস্ত বড় কারখানা তৈরি হয়েছে। হাওড়া এক শিল্প-প্রধান শহর। এখানে বিরাট্ পাটের কল, **দড়ির কল**, জাহাজ **মেরামতের কারখানা**, ময়দার আর তেলের কল, **লোহা-ইস্পাতের যন্ত্রপাতি** বা ছোট-খাটো জিনিসপত্র তৈরি করার অনেক কারখানা আছে।

কুটির-শিল্প—প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশ কুটির-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। যন্ত্রশিল্প বেশী দিনের নয়—ইংরেজরাই এদেশে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের শুরু করেন প্রায় ১৫০ বছরের কিছু আগে। কুটির-শিল্পের মধ্যে **হাতে-চালানো-তাঁতে** তৈরী কাপড়ই প্রধান। শান্তিপুর, হুগলী জেলার ফরাসডাঙ্গা (চন্দননগর), ধনেখালি, দেবীপুর, রাজ-বল্লভহাট প্রভৃতি জায়গার তাঁতের কাপড়, মুর্শিদাবাদ, মালদহ আর বিষ্ণুপুরের রেশমের কাপড় বিখ্যাত। এখন হাতে-চালানো-তাঁতে পশ্চিম-বঙ্গের আরও অনেক জায়গায় কাপড় তৈরী হয়। বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি, কৃষ্ণনগরের মাটির জিনিস, মুর্শিদাবাদের হাতির দাঁতে তৈরী নানারকম সুন্দর সুন্দর জিনিস আর খাগড়ার কাঁসার বাসন প্রসিদ্ধ।

আসা-যাওয়ার ব্যবস্থা : আজকাল জলে, স্থলে, এমনকি আকাশ-পথেও আসা-যাওয়া বা মালপত্র পাঠাবার সুবিধে রয়েছে। অনেক নদী মজে যাওয়ার ফলে আগে যেমন নদী দিয়ে নৌকা বা স্টিমারে আসা-

যাওয়া বা মালপত্র নিয়ে যাওয়ার সুবিধে ছিল এখন ততটা নেই। হুগলী নদী দিয়ে বড় বড় জাহাজ কলকাতায় আসতে পারে। অনেক জায়গাতে এখনও নৌকায় করে মালপত্র নিয়ে যাওয়া যায়। নদীপথে কলকাতা থেকে সুন্দরবন দিয়ে বাংলা দেশ ও আসাম যাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটা নামকরা রাস্তা আছে। **গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড** হাওড়া থেকে উত্তর-পশ্চিম দিক্ দিয়ে বর্ধমান, আসানসোল, ধানবাদ, পাটনা, দিল্লি হয়ে একেবারে পশ্চিম পাকিস্তান পর্যন্ত চলে গেছে। পশ্চিম দিকে **উড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড, মেদিনীপুর-রানীগঞ্জ রোড** আর পূর্ব-দিকে পাকিস্তানের সীমানা পর্যন্ত রাস্তা রয়েছে। কলকাতা থেকে একটা বড় রাস্তা দার্জিলিং পর্যন্ত গিয়েছে। এসব ছাড়া প্রত্যেক জেলাতেই অনেক কাঁচা ও পাকা রাস্তা আছে।

কলকাতায় শিয়ালদহ স্টেশন থেকে **পূর্ব-রেলপথ** উত্তর আর দক্ষিণ দিকে গিয়েছে। হাওড়া থেকে এই রেলপথ **উত্তর-পশ্চিম** দিকে বিহারের ভেতর দিয়ে উত্তর-প্রদেশে চলে গেছে। **দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথও** হাওড়া থেকে দক্ষিণ আর মধ্যভারতের দিকে গিয়েছে। **উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ** বিহারের পূর্ব দিকে, পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিকে আর আসামে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে।

কলকাতার কাছে দমদম একটা বড় **বিমান বন্দর**। এখান থেকে বিমান বা উড়োজাহাজ পৃথিবীর নানা জায়গায় আসা-যাওয়া করে। উত্তর দিকে জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার ইত্যাদি জায়গায় উড়োজাহাজে করে তাড়াতাড়ি যাতায়াত করা সম্ভব।

অধিবাসী : ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে লোকসংখ্যা গুনে দেখা গেছে যে পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা সে সময়ে ছিল প্রায় সাড়ে তিন কোটি। গত পাঁচ বছরে নিশ্চয়ই চার কোটির বেশী হয়েছে অনুমান করা যেতে পারে। এদের মধ্যে হিন্দু সব থেকে বেশী, তারপর মুসলমান। এছাড়া খ্রিস্টান, জৈন, শিখ, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্মের লোকও কিছু কিছু আছে। পশ্চিম-

বঙ্গের আয়তন ৩৩,৮২৯ বর্গমাইল। প্রতি বর্গমাইলে ১,০৩২ জন লোক আছে। অধিবাসীদের প্রতি এক হাজার লোকের মধ্যে ২৯৩ জন শিক্ষিত। সাঁওতাল, ওঁরাও, মুণ্ডা, হো, লেপ্চা, হাজং ইত্যাদি আদিবাসীদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ ৬৪ হাজারের কাছাকাছি বা শতকরা প্রায় ৬ জন। ৬২ লক্ষ ৩০ হাজারের অধিক লোক চাষবাস করে জীবন-ধারণ করে; কল-কারখানায় কাজ করে প্রায় ১৩ লক্ষ ১৯ হাজারের উপর লোক; ব্যবসা-বাণিজ্য করে ৮ লক্ষ ৭৬ হাজারের কিছু বেশী; চাকরি ইত্যাদিতে লোক আছে প্রায় ১৫ লক্ষ ৫০ হাজারের কাছাকাছি।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার বেশ তাড়াতাড়ি হচ্ছে। স্কুল-কলেজের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা, বিশ্বভারতী, যাদবপুর, বর্ধমান, রবীন্দ্রভারতী, উত্তরবঙ্গ আর কল্যাণী এই সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। গত ১৯৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে ৩২,৪৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৯৯৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৪৫টি কলেজ পশ্চিমবঙ্গে ছিল। এছাড়া ১১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ; ৩৫টি পলিটেকনিক্, ১৭৬টি টেক্‌নিক্যাল্ স্কুল, ১১টি ট্রেনিং কলেজ আর ৮টি বেসিক ট্রেনিং কলেজও ঐ সময়ে ছিল। প্রাথমিক, মাধ্যমিক আর টেক্‌নিক্যাল স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি বিশেষভাবে উল্লেখ করার মত।

শাসনব্যবস্থা : পশ্চিমবঙ্গে শাসনব্যবস্থা আমাদের সকলেরই জানা দরকার। পশ্চিমবঙ্গ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের একটা রাজ্য। শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে তিনটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। এই বিভাগগুলির নাম বর্ধমান বিভাগ, প্রেসিডেন্সী বিভাগ ও জলপাইগুড়ি বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগে কয়েকটি জেলা, আর জেলায় আছে কয়েকটি মহকুমা। বর্ধমান বিভাগের জেলাগুলির নাম—পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলী। প্রেসিডেন্সী বিভাগের জেলাগুলির নাম—হাওড়া, কলকাতা, চব্বিশ-পরগনা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ। জলপাইগুড়ি বিভাগের জেলা—

দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, পশ্চিম দিনাজপুর ও মালদহ। পশ্চিমবঙ্গে মোট ষোলটি জেলা। রাজ্যের প্রধান শাসনকর্তাকে বলা হয় রাজ্যপাল। বিভাগে আছেন বিভাগীয় কমিশনার। জেলা শাসন করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা জেলা শাসক, আর মহকুমা শাসনের ভার থাকে মহকুমা শাসকের উপর।

উত্তর লেখ

১। ভূপ্রকৃতি হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান অঞ্চলের নাম লেখ, আর এদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে ছোট ছোট বিবরণ দাও।

২। পশ্চিমবঙ্গের একটা মানচিত্র এঁকে তাতে প্রধান প্রধান পাহাড়, পর্বত আর নদ-নদী দেখাও।

৩। পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্র এঁকে তাতে বিভাগগুলি দেখাও। তোমার জেলা যে বিভাগে সেই বিভাগের সব জেলার সীমারেখা আঁক।

৪। পশ্চিমবঙ্গের মানচিত্রে প্রধান প্রধান রেলপথ আর রাস্তা দেখাও।

৫। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান প্রধান শস্য কি কি? শিল্পজাত জিনিস কি কি পাওয়া যায় তার বিবরণ দাও।

৬। পশ্চিমবঙ্গে ফসল বাড়াবার জন্য কিভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে?

৫

বিভিন্ন জেলার পরিচয়

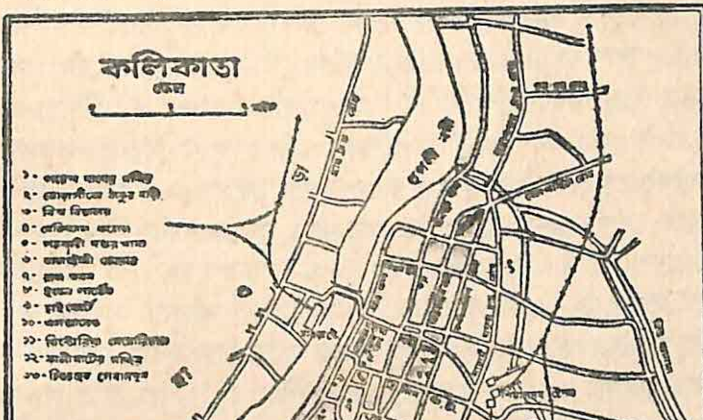
এর আগেই তোমাদের সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের একটা মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হয়েছে। এবার জেলাগুলির সঙ্গে বিশেষ পরিচয় হওয়া দরকার। এখানে যেসব জেলার মানচিত্র দেওয়া আছে তাতে নদী, মহকুমার সীমা, জেলা, মহকুমা আর থানার কয়েকটা নাম করা জায়গা, রেলপথ, বড় বড় রাস্তা ইত্যাদি দেওয়া আছে। তোমরা প্রথমে নিজের নিজের জেলার মানচিত্র বড় করে এঁকে মানচিত্রে যা যা দেওয়া আছে আঁকবে। তাছাড়া যতটা সম্ভব নিজের গ্রাম, পোস্টঅফিস, অন্য গ্রাম, হাট, মেলা, তীর্থের জায়গা, ছোট নদী, রাস্তা, খাল, বিল ইত্যাদি আঁকবার চেষ্টা কর।

প্রেসিডেন্সি বিভাগ : এই বিভাগের ৫টি জেলা সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

(১) কলকাতা

কলিকাতা বা চলতি কথায় কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী ভারতের সবথেকে বড় নগর আর বিরাট্ বন্দর। প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনারের অফিসও কলকাতাতে অবস্থিত। এই শহরের পশ্চিম দিকে হুগলী নদী, অন্য তিনদিকে চব্বিশ-পরগনা জেলা। বঙ্গোপসাগরে হুগলী নদীর মোহনা এই শহরের প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণে। সমুদ্রে চলে এই রকম মাঝারি-বড় ধরনের জাহাজ কলকাতার বন্দরে আসতে পারে। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের আগে কলকাতা সারা ভারতের রাজধানী ছিল। ভাগীরথী নদী দিয়ে বহুদিন থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে। এসবের জন্য কলকাতা ভারতের সবথেকে বড় বাণিজ্যের কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠে। এখান থেকে নদী, সমুদ্র, উড়োজাহাজ, রেল বা রাস্তা দিয়ে ভারতের মধ্যে

ও বাইরে নানা জায়গায় যাওয়া যায়। কলকাতা শহরকে একটা জেলা বলে ধরা হয়। এর আয়তন ৪০ বর্গমাইল। এই জেলাকে, মানে কলকাতাকে মহকুমায় ভাগ করা হয়নি। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে লোক গণনা



করার সময় লোকসংখ্যা ছিল ২৯ লক্ষের কিছু বেশী। প্রতি বর্গমাইলে এই শহরে ৭৩ হাজারের বেশী লোক বসবাস করে। এ থেকে বুঝতেই পারছ কলকাতায় বসতি কত ঘন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের লোক

এখানে তো আছেই, তাছাড়া ভারতের বাইরের অনেক দেশের কিছু কিছু লোক এখানে আছে। অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫৯ জনের কিছু উপর লেখাপড়া জানে।

রেলপথে ভারতের উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে যাওয়া আসা করতে গেলে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠতে হয়; আর উত্তর, উত্তর-পূর্ব বা দক্ষিণ দিকে যাওয়া আসার স্টেশন হল শিয়ালদহ। কয়েকটা গাড়ি অবশ্য অন্যদিকেও যায়। দুটি স্টেশনই বিরাট্, আর কত লোকের যে ভীড় তা দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। স্টেশন থেকে শহরে যাওয়ার জন্য মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাম, ঘোড়ার গাড়ি আর রিকশার বন্দোবস্ত আছে। কলকাতায় খুব বড় বড় বাড়ি আছে আর বাড়িগুলি খুব কাছাকাছি—একটা আর একটার সঙ্গে লেগে আছে। শহরের মধ্যে অনেক চওড়া রাস্তা আছে; মাটির নিচের নর্দমা দিয়ে ময়লা, জল ইত্যাদি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে। রাত্রে ইলেকট্রিক বা বিজলি বাতি রাস্তায় আলো দেয়। লোকজন বা গাড়ি ঠিকমত চলাচল করার জন্য বড় বড় রাস্তার মোড়ে লাল, সবুজ আর হলদে আলোর নিশানা আছে, এগুলি আপনা-আপনি জ্বলে ওঠে বা নিবে যায়। এছাড়া কলকাতার রাস্তায় পুলিস থাকে চলাফেরায় সাহায্য করার জন্য। গ্রাম থেকে যারা শহর দেখতে যাবে তারা ভালভাবে জেনে নেবে কিভাবে রাস্তা পার হতে হয়, রাস্তার কোন্ দিক্ ধরে চলতে হয়, ট্রামে, বাসে কোথায় কিভাবে উঠানামা করতে হয়, ট্যাক্সি বা মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদি কোন্‌খানে থাকে।

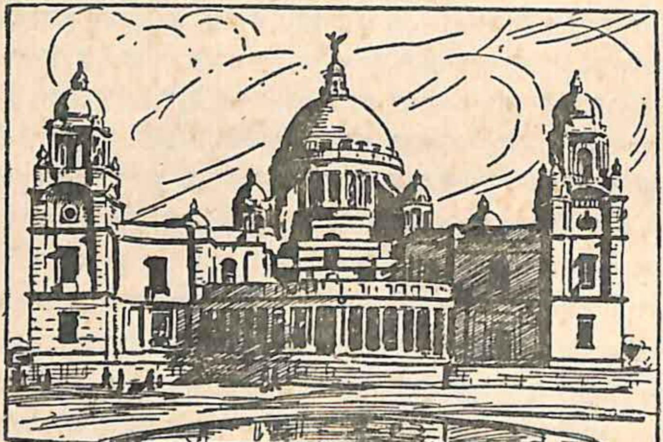
দেখবার জিনিস : হাওড়া ব্রীজ বা পুল। হুগলী নদীর পশ্চিম পারে হাওড়া আর পূর্ব পারে কলকাতাকে যে বিশাল পুল যুক্ত করেছে তাকে হাওড়ার পুল বলা হয়। এটা সম্পূর্ণ লোহা দিয়ে তৈরী। নদীর এক এক পারে দুটি করে বিরাট্ উঁচু ইস্পাতের স্তম্ভ। দুইপারের এই ৪টি স্তম্ভের সঙ্গে সমস্ত ব্রীজের বাকী অংশ আটকে রাখা হয়েছে।

অন্য ব্রীজে হয়ত দেখেছ নদীর জলের ভেতর থেকেই স্তম্ভের সার গড়ে তুলতে হয়; এই ব্রীজে সেরকম কিছু করা হয়নি—এটাকে ঝুলন্ত ব্রীজও বলা যেতে পারে। এইভাবে তৈরি করার ফলে এর নিচ দিয়ে নৌকা, স্টিমার ইত্যাদি অবাধে চলতে পারে। এতবড় ব্রীজও কিন্তু হাজার হাজার মানুষ ও গাড়ি চলাচলের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই আরও একটা ব্রীজ তৈরি করার কথা হচ্ছে। সেটা বর্তমান ব্রীজের কিছু দক্ষিণ দিকে তৈরি হবে বলে কথা হচ্ছে।

শহরের প্রায় মাঝামাঝি জায়গা জুড়ে রয়েছে **গড়ের মাঠ**, খেলাধুলো বা বেড়ানর পক্ষে খুব ভাল জায়গা। এই মাঠের পশ্চিম দিকে গঙ্গার ধারে রয়েছে ইংরেজ আমলের **ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ**। এই দুর্গ থেকে মাইল খানেক দক্ষিণ-পশ্চিমে রয়েছে **খিদিরপুর ডক**—সমুদ্রে যাওয়া-আসা করে এমন সব জাহাজ এঘাটে এসে ভিড়ে অথবা এখান থেকে ছাড়ে। গঙ্গা নদী থেকে খাল কেটে তার উপর ডক তৈরি করা হয়েছে। খিদিরপুর ডক থেকে কিছুদূরে **কিং জর্জ ডক**। গড়ের মাঠের উত্তর দিকে **ইডেন-গার্ডেন, বিধানসভা, হাইকোর্ট, রাজভবন** আর **রাইটার্স বিল্ডিংস** বা সরকারী দপ্তরখানা দেখবার মতো। শিয়ালদহ থেকে উত্তর দিকে খুব সুন্দর জৈনদের **পরেশনাথের মন্দির** দেখা যায়। দক্ষিণ কলকাতায় আছে হিন্দুদের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান **কালীঘাটের কালীমন্দির**। এছাড়া **রবীন্দ্র-সরোবর** ও তার সংলগ্ন **স্টেডিয়াম, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন**। আর গোলপার্কে রামকৃষ্ণ মিশনের বাড়ি দেখবার মতো। কলকাতার পূর্বদিকে লবণহ্রদ অঞ্চলকে কিভাবে বসবাসের জন্য গঙ্গার পলি দিয়ে ভরাট করা হয়েছে তাও দ্রষ্টব্য। এসব ছাড়া কলকাতায় অনেক শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান সকলেরই দেখা উচিত।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর **প্রেসিডেন্সী কলেজ** একশ বছরেরও আগে স্থাপিত হয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন্ ফর দি কাল্টিভেশন্ অফ্ সায়েন্স,

ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ্ সায়েন্স এ্যান্ড টেক্নোলজী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভবনগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অবস্থিত। এখানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জন্মেছিলেন। জওহরলাল নেহরু রোডের (চৌরঙ্গী) উপর রয়েছে ভারতের সব থেকে বড় যাদুঘর। এখানে যেসব পুরান টাকা পয়সা, পুঁথি, ছবি, মূর্তি বা পাথর আছে সেগুলি থেকে ভারতবর্ষের



ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল

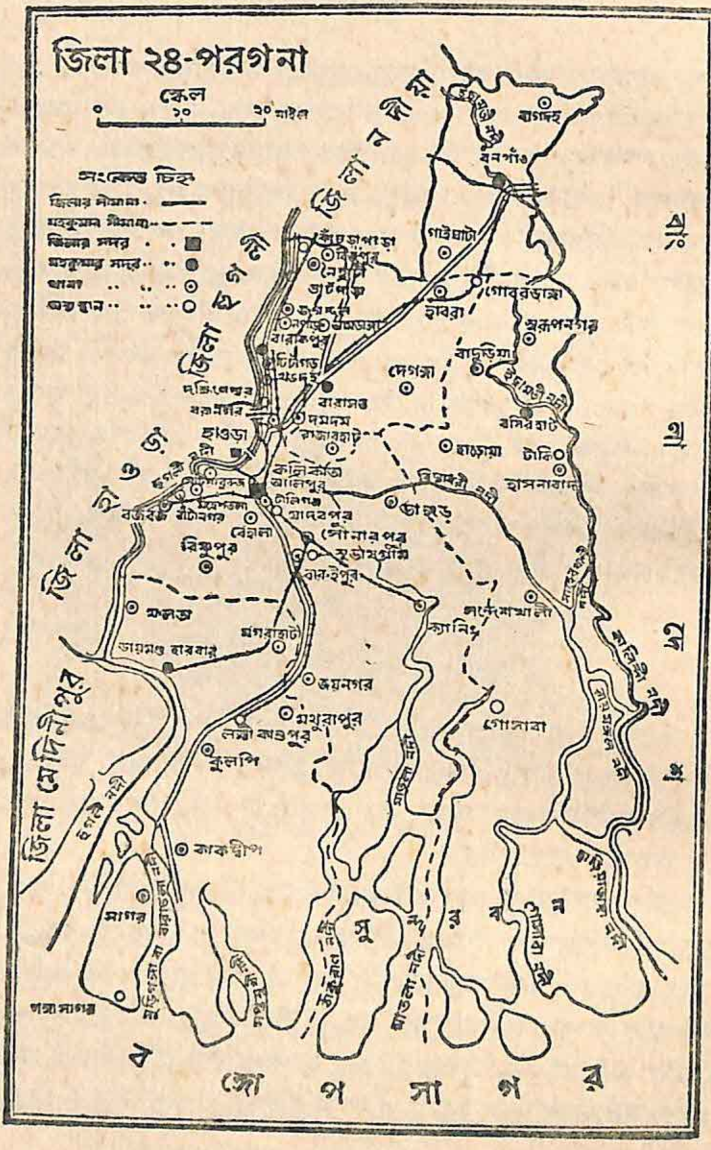
বহুযুগ আগেকার ইতিহাস, সভ্যতা ইত্যাদির নানা কথা জানা যায়। এছাড়া এখানে বহু পুরান যুগের জীবজন্তুর কঙ্কালও রয়েছে। গড়ের মাঠের দক্ষিণদিকে দেখা যাবে **ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল**—শ্বেত পাথরের তৈরি মহারানী ভিক্টোরিয়ার বিরাট্ স্মৃতিসৌধ আর তার সংলগ্ন বাগান। এখানে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপন আর তার প্রসারের বড় বড় ছবি, দলিলপত্র, দামী দামী মূর্তি, অস্ত্র-শস্ত্র, ইত্যাদি

দেখান হয়েছে। আলীপুরের জু-গার্ডেন বা পশুশালায় ভারতের আর অন্যান্য দেশের অনেক রকমের জীবজন্তু দেখা যায়। এর কাছেই ভারতের সবথেকে বড় জাতীয় গ্রন্থাগার বা ন্যাশনাল লাইব্রেরি। জাতীয় গ্রন্থাগারে শিশু-বিভাগে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পুস্তকে আগ্রহ জন্মানোর বিশেষভাবে চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া কলকাতা সম্বন্ধে জানবার জন্য **ক্যালকাটা ইনফরমেশন সেন্টার** রয়েছে ময়দানের দক্ষিণ-দিকে, আর ওর কাছাকাছি রয়েছে **বিড়লা প্ল্যানেটারিয়াম** আর **রবীন্দ্র-সদন**। প্ল্যানেটারিয়ামে আকাশের তারা, গ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে চাক্ষুষ বিবরণ পাওয়া যায়। কলকাতায় লেখাপড়া শেখার সুযোগ অনেক আছে। এখানে অনেক স্কুল, কলেজ আর লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার আছে। কলকাতার ময়দানে ফুটবল বা হকি খেলা আর ইডেন গার্ডেনের স্টেডিয়ামে ক্রিকেট খেলা দেখতে অনেকেই বাইরে থেকে আসেন। টেনিস খেলার মাঠ খুব ভাল আছে সাউথ ক্লাবে।

(২) চব্বিশ-পরগনা জেলা

সীমা আর আয়তন—এই জেলার উত্তরে নদীয়া, পূর্বে বাংলা দেশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলী নদী আর কলকাতা। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এর আয়তন ৫২৮৫ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা প্রায় ৬২ লক্ষ ৮১ হাজার ছিল।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—চব্বিশ-পরগনা জেলার বেশির ভাগই সমতল। দক্ষিণদিকে বিখ্যাত **সুন্দরবন**। সুন্দরবন অঞ্চলে সমুদ্রের ধারের জমি বেশ নিচু, জোয়ার এলে জল ডাঙার উপর অনেক জায়গায় উঠে আসে। **হুগলী, বিদ্যাধরী, যমুনা, ইছামতী, কালিন্দী, রায়মঙ্গল** ইত্যাদি নদী এই জেলার ভেতর দিয়ে বা পাশ দিয়ে বয়ে গিয়েছে, আর এদের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা প্রায় সমগ্র জেলাকে জুড়ে রয়েছে বিশেষ


জিলা ২৪-পরগনা
স্কেল
০ ১০ ২০ মাইল
সংকেত চিহ্ন
বাগদহ
বনগাঁও
গাইঘাটা
গোবরডাঙ্গা
হাবরা
স্বরূপনগর
বাদুড়িয়া
দেগঙ্গা
বারাসত
বসিরহাট
দমদম
হাড়োয়া
টাকি
হাসনাবাদ
কলিকাতা
আলিপুর
বেহালা
বিষ্ণুপুর
সোনারপুর
বারুইপুর
ক্যানিং
মগরাহাট
জয়নগর
মথুরাপুর
কুলপি
কাকদ্বীপ
সাগর
গোসাবা
হাওড়া
ফলতা
ডায়মণ্ড হারবার
জিলা নদীয়া
জিলা হুগলী
জিলা হাওড়া
জিলা মেদিনীপুর
বাংলাদেশ
সুন্দরবন
বঙ্গোপসাগর

করে সুন্দরবন অঞ্চলে। কোন কোন নদী বঙ্গোপসাগরে পড়ে বড় বড় মোহনার সৃষ্টি করেছে—এদের নাম বড়তলা, সপ্তমুখী, ঠাকুরান, মাতলা, গোসাবা, হাড়িয়াভাঙ্গা ইত্যাদি।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান আর পাট প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। এছাড়া কলাই, সরষে, নারকেল, সুপুরি, শাক-সবজি আর মাছ প্রচুর হয়। সুন্দরবনের প্রায় অর্ধেক সরকারের সংরক্ষিত বন—যেখানে গাছকাটা, শিকার করা ইত্যাদি সরকারী অনুমতি ছাড়া চলে না। এই বন থেকে দামী কাঠ, জ্বালানি-কাঠ, গোলপাতা, মধু আর মোম পাওয়া যায়। সুন্দরবনে নানারকমের পাখি, হরিণ, বাঘ, কুমির, সাপ, বাঁদর, আর শুয়োর বাস করে। সুন্দরবনের মানুষ-খেকো বাঘ 'রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার' নামে বিখ্যাত।

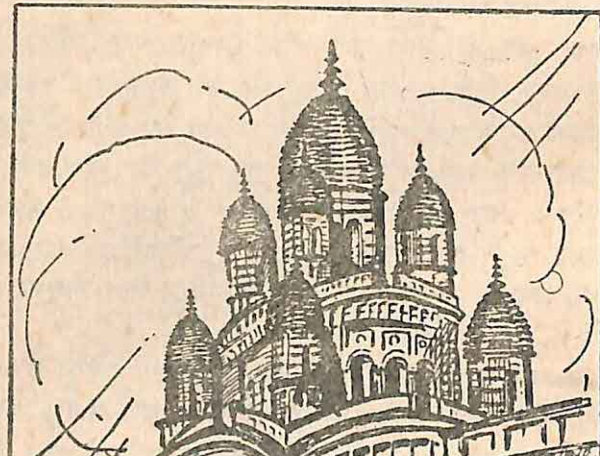
শিল্প—এই জেলায় প্রচুর কল-কারখানা আছে। এইসব কারখানায় চট, চটের থলে, কাপড়, জুতা, কাগজ, যন্ত্রপাতি, কাচ আর চীনেমাটির বাসন, নানারকমের খেলনা, সাবান, ওষুধপত্র ইত্যাদি তৈরী হয়। উত্তরে কাঁচড়াপাড়ার কাছ থেকে দক্ষিণে বজবজ পর্যন্ত হুগলী নদীর পূর্ব পারে এই শিল্পাঞ্চল বিস্তৃত।

যাতায়াত—এই জেলার রেলপথ আর রাস্তা দেখে বিভিন্ন জায়গায় কিভাবে যাওয়া যায় লক্ষ্য কর।

মহকুমা—চব্বিশ-পরগনায় ৬টি মহকুমা আছে, যথা—আলিপুর (সদর), ব্যারাকপুর, বারাসত, বসিরহাট, বনগাঁ আর ডায়মণ্ডহারবার।

শহর আর প্রসিদ্ধ জায়গা—কলকাতার দক্ষিণদিকে আলিপুর এই জেলার সদর শহর। এখানকার চিড়িয়াখানা ও জাতীয় গ্রন্থাগারের কথা আগেই বলা হয়েছে। **যাদবপুর** বিশ্ববিদ্যালয়, সোনারপুরের কাছে **সুভাষগ্রামে** নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পৈতৃক বসতবাড়ি এই জেলাতেই। ব্যারাকপুরে হুগলী নদীর ধারে মহাত্মা গান্ধীর চিতা-ভস্মের উপর নির্মিত স্মৃতিমন্দিরটি বেশ সুন্দর। এখানে রাজ্যপালের

ভবন আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুলিস ট্রেনিং কলেজ অবস্থিত। এই শহরের মণিরামপুরে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের বাড়ি। দমদম ভারতের



দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি

সবথেকে বড় উড়োজাহাজের ঘাঁটি। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসদেবের সাধনাক্ষেত্র। নৈহাটির কাছে **কাঁটালপাড়ায়** সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের পৈতৃক বসতবাড়ি—এখানেই তিনি 'বন্দেমাতরম্' গান রচনা করেছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আর নৈহাটির কাছে হুগলী নদীর উপরে দুটো ব্রীজ আছে—এদের নাম যথাক্রমে **বিবেকানন্দ ব্রীজ** আর **জুবিলি ব্রীজ**। **কাশীপুর** আর **ইছাপুর** অস্ত্র-শস্ত্র তৈরি করার কারখানার জন্য বিখ্যাত। **কাঁচড়াপাড়ায়** রেলের কারখানা আছে। **হাবড়াতে** একটা নূতন শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে। হুগলী (গঙ্গা) নদী যেখানে বঙ্গোপসাগরের সঙ্গে মিলেছে সেখানে সাগর দ্বীপে **গঙ্গাসাগর** নামে জায়গাটিতে পৌষ সংক্রান্তিতে খুব বড় এক মেলা বসে। ভারতের নানা জায়গা থেকে তীর্থযাত্রীরা স্নানের জন্য এ-মেলায় আসে।

(৩) নদীয়া জেলা

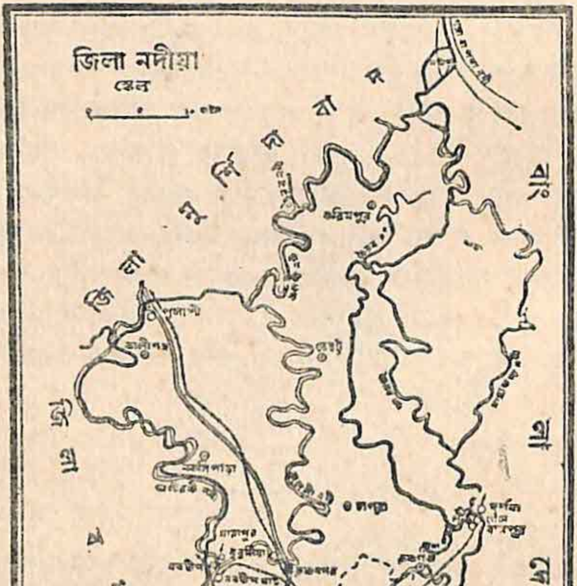
সীমা আর আয়তন—উত্তরে মুর্শিদাবাদ জেলা আর পদ্মা নদী, পূর্বে বাংলা দেশ, দক্ষিণে চব্বিশ-পরগনা জেলা, পশ্চিমে বর্ধমান আর হুগলী জেলা। এই জেলা আয়তনে ১৫১৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে ১৭ লক্ষ ১৩ হাজারের কিছু বেশী। বাংলা দেশ থেকে অনেক উদ্বাস্তু পরিবার এখানে এসে নূতনভাবে বসবাস শুরু করেছে।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—এই জেলার ভূমিও সমতল। ভাগীরথী (গঙ্গা), জলঙ্গী, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, চূর্ণী আর ইছামতী এই জেলার প্রধান নদী।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, ডাল, গম, আখ ইত্যাদি।

যাতায়াত—মানচিত্রে রেল লাইন আর রাস্তা লক্ষ্য কর।

মহকুমা—দুটি মহকুমা—কৃষ্ণনগর (সদর) আর রানাঘাট।


জিলা নদীয়া
স্কেল

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—**কৃষ্ণনগর** এই জেলার সদর শহর, জলঙ্গী নদীর ধারে অবস্থিত। এখানকার মাটির পুতুল আর খেলনা বিখ্যাত। বিখ্যাত নাট্যকার ও কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এখানে জন্মেছিলেন। **নবদ্বীপ** ভাগীরথীর পশ্চিম পারের এক প্রাচীন আর বিখ্যাত শহর। প্রায় আটশ বছর আগে বাংলার শেষ স্বাধীন সেন বংশীয় রাজাদের রাজধানী এখানে ছিল। নবদ্বীপ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান আর বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। এককালে সংস্কৃত শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে ভারতে নবদ্বীপের খ্যাতি ছিল। জেলার উত্তর-পশ্চিম দিকে **পলাশীর মাঠে** প্রায় ২০০ বছর আগে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লা হেরে যান আর সেই থেকে ভারতে ইংরেজ রাজত্বের গোড়াপত্তন হয়। পলাশীতে একটা চিনির কল আছে। **শান্তিপুর** রানাঘাট মহকুমায় অবস্থিত এক প্রাচীন শহর আর বৈষ্ণবদের তীর্থস্থান। এখানকার তাঁতের কাপড় বিখ্যাত। **ফুলিয়া** বিখ্যাত বাংলা রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। **কল্যাণীতে** এক সুন্দর নূতন শহর গড়ে উঠেছে ; এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। **হরিণঘাটাতে** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দুধ সরবরাহের বিরাট্ কেন্দ্র আছে।

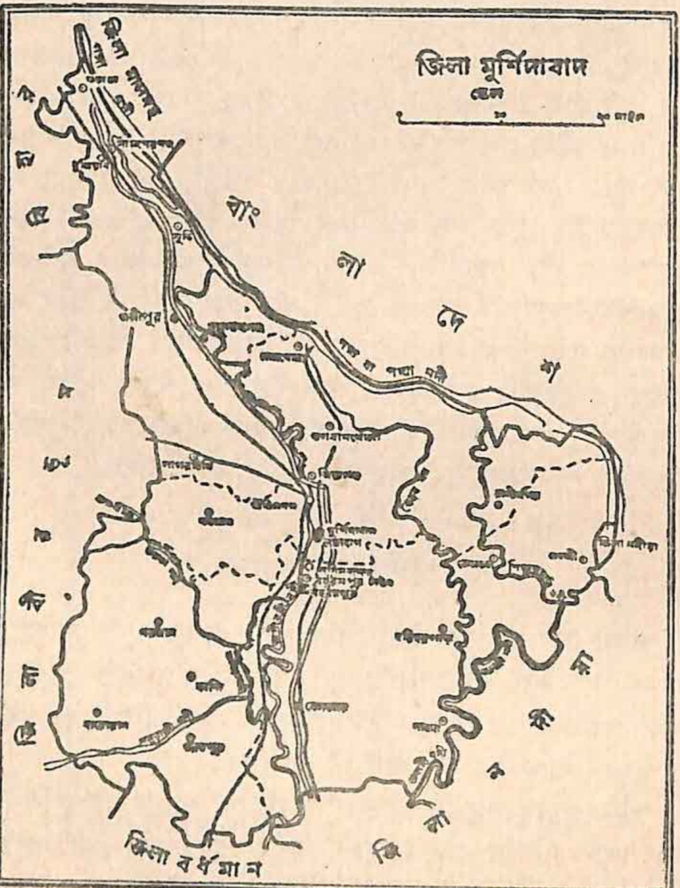
(৪) মুর্শিদাবাদ জেলা

সীমা আর আয়তন—উত্তরে গঙ্গা আর পদ্মা, পূর্বে বাংলা দেশ আর নদীয়া জেলা, দক্ষিণে নদীয়া আর বর্ধমান জেলা, পশ্চিমে বীরভূম জেলা আর বিহারের কিছু অংশ। আয়তন ২০৫৬ বর্গমাইল। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে লোকসংখ্যা ২২ লক্ষ ৯০ হাজার।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—ভাগীরথী নদী জেলার মাঝামাঝি দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে চলেছে। নদীর পূর্বদিকের জমি সমতল; পশ্চিমদিকে কিছু অসমতল জমি আছে। ভাগীরথী ছাড়া **ব্রাহ্মণী,**

দ্বারকা, ময়ূরাক্ষী, ভৈরব, শিয়ালমারি, জলঙ্গী ইত্যাদি এই জেলার প্রধান প্রধান নদী।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, আখ, গম, ডাল আর তৈলবীজ। রেশম



পোকার জন্য তুঁতের চাষ হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলার আম বিখ্যাত।

যাতায়াত—রেলপথ, রাস্তা আর জলপথ মানচিত্র দেখে বার কর।

মহকুমা—বহরমপুর (সদর), লালবাগ, জঙ্গীপুর আর কান্দি এই জেলার চারটি মহকুমা।

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—ভাগীরথীর তীরে **বহরমপুর** এই জেলার সদর শহর। **খাগড়ার** কাঁসার বাসন বিখ্যাত। **কাশিমবাজার** মহারানী স্বর্ণময়ী আর দানবীর মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর বাসভূমি। এখানে কাপড়ের কল আছে। **মুর্শিদাবাদ** ইংরেজ রাজত্বের আগে বাংলার নবাবদের রাজধানী ছিল। এখানকার 'হাজার-দুয়ারী' নামক নবাবের প্রাসাদ দেখবার মতো। ভাগীরথী নদীর ধারে অবস্থিত এই শহরে নদীর ধারে ধারে নবাবী আমলের অনেক বাগান, বাড়ি ইত্যাদি রয়েছে। **লালবাগ, কান্দি** আর **জঙ্গীপুর** মহকুমা-শহর। **আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, বেলডাঙ্গা** আর **ধুলিয়ান** ব্যবসা-বাণিজ্যের জায়গা। ফারাক্কায় পদ্মা নদীর উপর বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে।

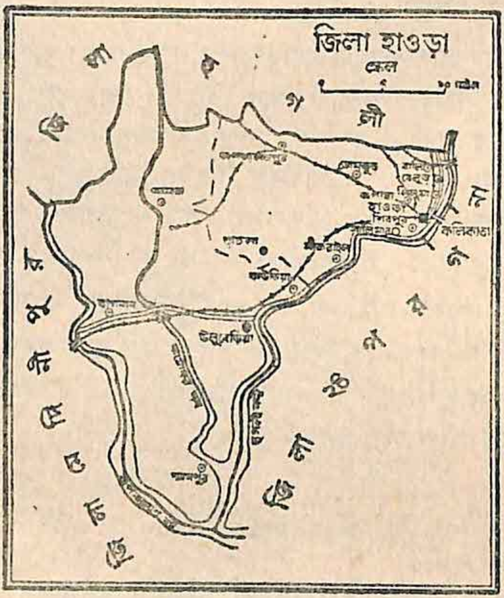
(৫) হাওড়া জেলা

সীমা আর আয়তন—উত্তরে হুগলী জেলা, পূর্বে হুগলী নদী, অপর পারে কলকাতা আর চব্বিশ-পরগনা জেলা, দক্ষিণ ও পশ্চিমে রূপনারায়ণ নদ আর মেদিনীপুর জেলা। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আয়তন ৫৭৫ বর্গ-মাইল আর লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ ৩৮ হাজারের কিছু বেশী ছিল। কলকাতা ছাড়া অন্য সব জেলার মধ্যে হাওড়াই আয়তনে সবথেকে ছোট।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—হুগলী, রূপনারায়ণ আর দামোদর এই জেলার প্রধান নদ বা নদী। হাওড়া জেলায় **খাল, বিল, খানা, ডোবা**

ইত্যাদি প্রচুর আর অনেক জায়গা বেশ নিচু; ফলে বর্ষার জলে অনেক জায়গা ডুবে যায়।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, আলু, পান, নারকেল ইত্যাদি এই জেলার প্রধান প্রধান চাষের জিনিস।



মহকুমা—এই জেলায় দুটি মহকুমা—হাওড়া আর উলুবেড়িয়া।

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—হাওড়া এই জেলার সদর শহর আর পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় প্রধান শহর। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে হাওড়া শহরের লোকসংখ্যা ছিল ৫,১২,৫৯৮ বা ৫ লক্ষের কিছু উপর। এই শহর শিল্প আর বাণিজ্যের বড় কেন্দ্র; অনেক কল-কারখানা এখানে দেখা যায়। হাওড়া জেলার সাঁত্রাগাছি আর লিলুয়াতে রেলের কারখানা আছে। উলুবেড়িয়া

মহকুমা-শহর। এর কাছেই কয়েকটা পাটের কল আছে। হাওড়া শহরের **শিবপুর, শালিমার, রামকৃষ্ণপুর, সালকিয়া, বেলিলিয়স রোড** অঞ্চলে, তাছাড়া **বেলুড়, বালি** ইত্যাদি শহরে অনেক কল-কারখানা আছে। শিবপুরে বিখ্যাত **বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ** রয়েছে। এখানকার **বোটানিক্যাল গার্ডেনস্‌** বা গাছ-গাছড়ার বাগান বিখ্যাত। বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয় রয়েছে।

যাতায়াত—হাওড়ার রেল স্টেশন ভারত-বিখ্যাত। এখান থেকে রেলপথে উত্তর-ভারতে, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি জায়গায় যাওয়া যায়। এছাড়া হাওড়া থেকে ছোট রেলপথে আমতা আর হুগলী জেলার চাঁপাডাঙ্গা, জনাই, শিয়াখালা পর্যন্ত যাওয়া যায়। বিখ্যাত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড হাওড়ার শিবপুর এলাকা থেকে শুরু হয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমানা পর্যন্ত গিয়েছে।

বর্ধমান বিভাগ : এই বিভাগের ছয়টি জেলার বিবরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে।

(১) হুগলী জেলা

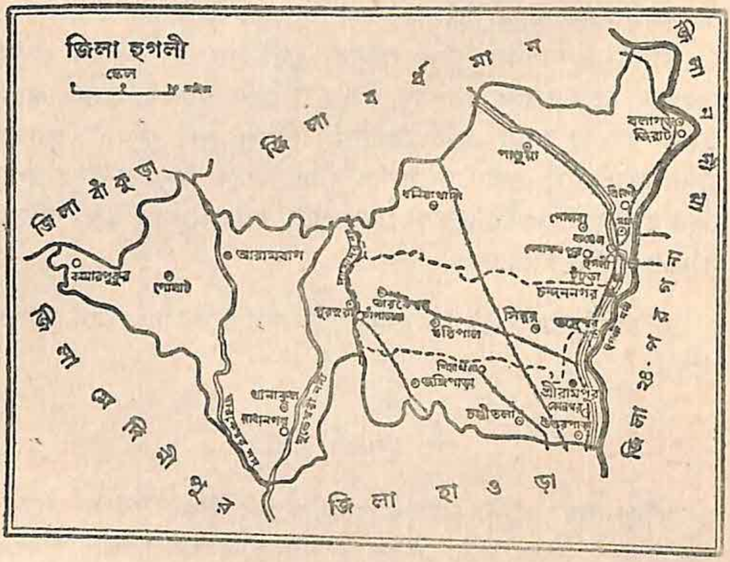
সীমা আর আয়তন—উত্তরে বর্ধমান আর বাঁকুড়া জেলা; পূর্বে হুগলী নদী, অপর পারে নদীয়া ও চব্বিশ পরগনা জেলা; দক্ষিণে হাওড়া আর মেদিনীপুর জেলা; পশ্চিমে মেদিনীপুর আর বাঁকুড়া জেলা। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আয়তন ১২১৬ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ২২ লক্ষ ৩১ হাজারের কিছু বেশী ছিল।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—**দ্বারকেশ্বর, মুণ্ডেশ্বরী, দামোদর** আর **হুগলী** প্রধান নদ বা নদী। এই জেলার জমি সমতল।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, কলাই, আলু আর আখ এই জেলার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য।

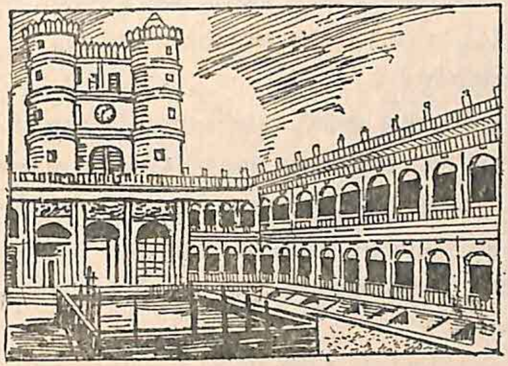
মহকুমা—হুগলী (সদর), চন্দননগর, শ্রীরামপুর আর আরামবাগ এই জেলার চারটি মহকুমা।

শিল্প—হুগলী নদীর ধারে ধারে বেশির ভাগ কল-কারখানা দেখা যায়। রেল লাইনের ধারে ধারেও অনেক শিল্প গড়ে উঠেছে। **কোন্নগরের**



কাছে মোটর গাড়ি তৈরির আর সাহাগঞ্জে মোটর গাড়ির রবারের চাকা ও অন্যান্য নানারকমের রবারের জিনিস তৈরি করার কারখানা আছে। **বাঁশবেড়িয়া, চাঁপাদানি, রিষড়া** ইত্যাদি শহরে পাটের কল আছে। **শ্রীরামপুরের** কাছে পাট আর কাপড়ের কল আছে। হুগলী জেলায় **ফরাসডাঙ্গা** (চন্দননগর), **ধনেখালি, শ্রীরামপুর, রাজবল্লহাট** ইত্যাদি জায়গায় প্রচুর তাঁতের কাপড় বোনা হয়।

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—চুঁচুড়া এই জেলার প্রধান শহর। বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের অফিসও এখানে। চুঁচুড়ার কাছে পুরান শহর হুগলী; এখানে হুগলীর ইমামবাড়া দানশীল হাজি মহম্মদ মহসীনের



হুগলীর ইমামবাড়া

কীর্তি। মহসীনের সমাধিও এখানে রয়েছে। **চন্দননগর** আগে ফরাসীদের হাতে ছিল; এখন একটা মহকুমা-শহর। **শ্রীরামপুর** আর **আরামবাগ** মহকুমা শহর। **তারকেশ্বর** আর **ত্রিবেণী** হিন্দুদের তীর্থস্থান। আরামবাগ মহকুমায় **রাধানগর** ভারতের সুসন্তান রাজা রামমোহন রায়ের জন্মস্থান। **কামারপুকুর** শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের, আর হুগলীর কাছে **দেবানন্দপুর** বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মস্থান। **জিরাট** স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক বাসস্থান।

যাতায়াত—প্রধান প্রধান রেলপথ ছাড়া শেওড়াফুলি থেকে তারকেশ্বর পর্যন্ত এক শাখা-রেলপথ রয়েছে। ছবিতে বা মানচিত্রে অন্য রেলপথ লক্ষ্য কর। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এই জেলার প্রধান রাস্তা।

(২) বর্ধমান জেলা

সীমা আর আয়তন—উত্তরে বীরভূম আর মুর্শিদাবাদ জেলা; পূর্ব-দিকে ভাগীরথী নদী আর অপরপারে নদীয়া জেলা; দক্ষিণে হুগলী আর বাঁকুড়া জেলা, পশ্চিমে বিহার রাজ্য। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এই জেলার আয়তন ২৭১৬ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ লক্ষ ৮৩ হাজারের কাছাকাছি।

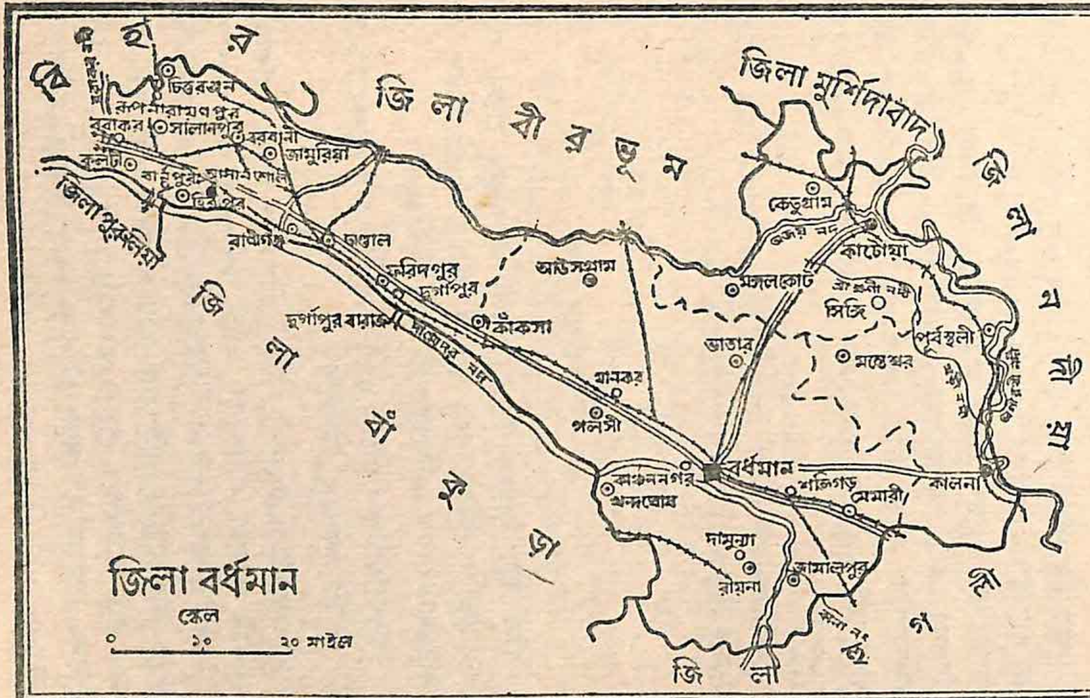
ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—এই জেলার পশ্চিমদিকের জমি উঁচু-নিচু আর পূর্বদিকের জমি সমতল আর মাটিও খুব ভাল, ফসলের পক্ষে উপযোগী। পশ্চিমদিকে রানীগঞ্জের কয়লা ভারতের মধ্যে বিখ্যাত, তামা আর আকরিক লোহাও এই অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ভাগীরথী, বরাকর, দামোদর, কানা, ব্রাহ্মণী আর **খড়ি** এই জেলার প্রধান নদ বা নদী।

উৎপন্ন দ্রব্য—এই জেলা ধান চাষের জন্য বিখ্যাত। ধান ছাড়া আখ, আলু, তৈলবীজ ও অন্যান্য অনেক জিনিসের চাষ এই অঞ্চলে হয়।

মহকুমা—এই জেলায় মহকুমা চারটি—বর্ধমান (সদর), আসানসোল, কালনা আর কাটোয়া।

শিল্প—বর্ধমান জেলায় অনেক বড় বড় কল-কারখানা আছে। **বার্নপুর** লোহা ও ইস্পাতের কারখানা, **চিত্তরঞ্জন** রেল-ইঞ্জিন তৈরির এক বিরাট্ কারখানা আর **রূপনারায়ণপুর** ইলেকট্রিক তার তৈরির কারখানার জন্য বিখ্যাত। **রানীগঞ্জ** কয়লার খনি, কাগজের কল আর টালির কারখানার জন্য প্রসিদ্ধ। **দুর্গাপুরে** দামোদর নদের ব্যারাজ (কপাটবাঁধ) তৈরি করে খালের সাহায্যে বিরাট্ এক অঞ্চলে চাষের জল যোগান দেওয়া হচ্ছে। এখানে লোহা আর ইস্পাত তৈরির বিরাট্ এক কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। **কাঞ্চননগরে** ভাল ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি তৈরী হয়।



জিলা বীরভূম
জিলা মুর্শিদাবাদ
জিলা পুরুলিয়া
চিত্তরঞ্জন
রূপনারায়ণপুর
বরাকর
সালানপুর
জামুরিয়া
কুলটি
আসানসোল
রাণীগঞ্জ
অণ্ডাল
ফরিদপুর
দুর্গাপুর
দুর্গাপুর ব্যারাজ
দামোদর নদ
কাঁকসা
আউসগ্রাম
কেতুগ্রাম
অজয় নদ
কাটোয়া
মঙ্গলকোট
সিঙ্গি
ভাতার
মন্তেশ্বর
পূর্বস্থলী
মানকর
পলসী
বর্ধমান
কাঞ্চননগর
খণ্ডঘোষ
শক্তিগড়
মেমারী
কালনা
দামুন্যা
রায়না
জামালপুর
জিলা বর্ধমান
স্কেল
০ ১০ ২০ মাইল

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—জেলার সদর শহর **বর্ধমান**। গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড শহরের মাঝখান দিয়ে গিয়েছে। এখানে একটি নূতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। **কালনা** আর **কাটোয়া** মহকুমা-শহর ও ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। **আসানসোল** মহকুমা-শহর ও বড় রেল জংশন। আসানসোলের কাছে অনেক কয়লার খনি আর কল-কারখানা আছে। **সিঙ্গি** কবি কাশীরাম দাসের আর **দামুন্যা** কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের জন্মস্থান।

যাতায়াত—গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড এই জেলার মাঝখান দিয়ে গিয়েছে। মানচিত্রে রেলপথ আর পাকা রাস্তা দেখ।

(৩) মেদিনীপুর জেলা

সীমা আর আয়তন—উত্তরে হুগলী ও বাঁকুড়া জেলা, পূর্বে রূপনারায়ণ নদ, হাওড়া আর হুগলী জেলা, পশ্চিমে বিহার আর উড়িষ্যা রাজ্য, দক্ষিণে উড়িষ্যা রাজ্য আর বঙ্গোপসাগর।

১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আয়তন ৫২৫৮ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ছিল ৪৩ লক্ষ ৪২ হাজারের কাছাকাছি।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—হুগলী, রূপনারায়ণ, শিলাবতী (শিলাই), **কংসাবতী** (**কাঁসাই**), **কালিয়াঘাই**, **হলদি**, **রসুলপুর** আর **সুবর্ণরেখা** এই জেলার প্রধান নদ বা নদী। মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিম দিকে পাথুরে আর উঁচুনিচু, মাটি লাল আর কাঁকুরে। পূর্ব আর দক্ষিণ দিকের জমি অপেক্ষাকৃত নিচু ও চাষবাসের পক্ষে বেশ ভাল। উত্তর-পশ্চিমের অধিবাসীদের মধ্যে সাঁওতাল, মুডা ইত্যাদি আদিবাসীও আছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান এই জেলার প্রধান ফসল। এছাড়া পাট আর কলাইয়ের চাষও হয়। কাজুবাদাম এখানে ভাল জন্মায়। উত্তর-পশ্চিম দিকে বন আছে, তাতে শাল, মহুয়া ইত্যাদি গাছ যথেষ্ট হয়।

শিল্প—পিতল-কাঁসার বাসন, তাঁতের কাপড় আর মাদুর এখানকার প্রধান কুটির-শিল্প।

মহকুমা—মেদিনীপুর (সদর), ঘাটাল, তমলুক, কাঁথি আর ঝাড়গ্রাম।



শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—জেলার সবথেকে বড় শহর মেদিনীপুর, কাঁসাই নদীর ধারে অবস্থিত। খড়্‌গপুর এক বড় রেলওয়ে জংশন। এখানে রেলের ইঞ্জিন আর গাড়ি মেরামতের বিরাট্ কারখানা আছে। খড়্‌গপুরের কাছেই হিজলীতে এক উচ্চ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে

(ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী)। **ঘাটাল** মহকুমা-শহর। এই মহকুমায় **বীরসিংহ** গ্রামে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন। **তমলুক** মহকুমা-শহর, রূপনারায়ণ নদের ধারে অবস্থিত। খুব প্রাচীন-কালের বিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দর এখানেই ছিল। **কাঁথি** মহকুমা-শহর। **দিঘা** সমুদ্রের ধারে এক স্বাস্থ্যকর জায়গা। **ঝাড়গ্রাম** মহকুমা-শহর আর স্বাস্থ্যকর জায়গা।

যাতায়াত—খড়্গপুর থেকে রেলপথে হাওড়া, বাঁকুড়া হয়ে পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম হয়ে ভারতের মধ্য ও পশ্চিম অঞ্চল এবং দাঁতন হয়ে দক্ষিণ ভারত যাওয়া যায়। মানচিত্রে রেলপথ আর প্রধান প্রধান রাস্তা দেখ।

(৪) বাঁকুড়া জেলা

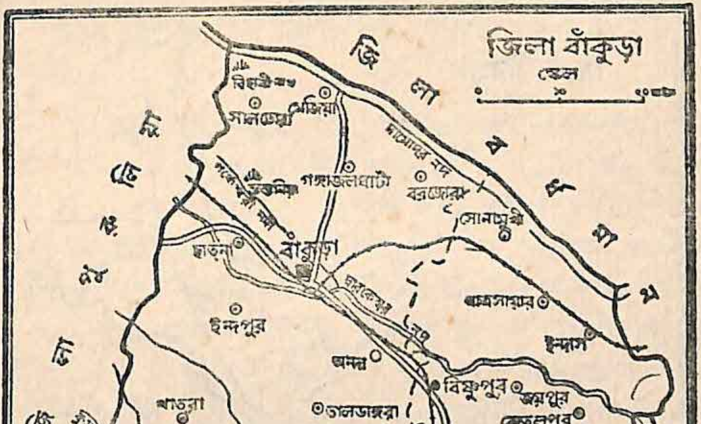
সীমা আর আয়তন—উত্তরে দামোদর নদের অপরপারে বর্ধমান জেলা, পূর্বে বর্ধমান আর হুগলী জেলা, পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা আর দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলা। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আয়তন ২৬৫০ বর্গমাইল ও লোকসংখ্যা ১৬ লক্ষ ৬৪ হাজারের কিছু বেশী ছিল।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—এই জেলার পশ্চিমদিকের জমি উঁচু-নিচু, মাটি লাল আর কাঁকুরে। ছোট-ছোট পাহাড়ও কিছু কিছু দেখা যায়—এর মধ্যে বিহারীনাথ আর শুশুনিয়া পাহাড় নাম করার মতো। এই অঞ্চলের লোকদের মধ্যে আদিবাসী সাঁওতাল, মুণ্ডা প্রভৃতিরা রয়েছে। **দামোদর, গন্ধেশ্বরী, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কংসাবতী** আর **কুমারী** এই জেলার নদ বা নদী।

উৎপন্ন দ্রব্য—এই জেলায় ধান, কলাই, গম, আলু ইত্যাদির চাষ হয়। বৃষ্টিপাত কম হয় বলে বৃষ্টির জল বিরাট্ বিরাট্ পুকুরে ধরে রেখে

চাষ-আবাদ করা হয়। বাঁকুড়া, হুগলী, মেদিনীপুর আর পুরুলিয়া জেলার কিছুটা অংশে ভাল করে সেচের জল দেবার জন্য কংসাবতী আর তার উপনদী কুমারীতে বাঁধ তৈরী করা হচ্ছে।

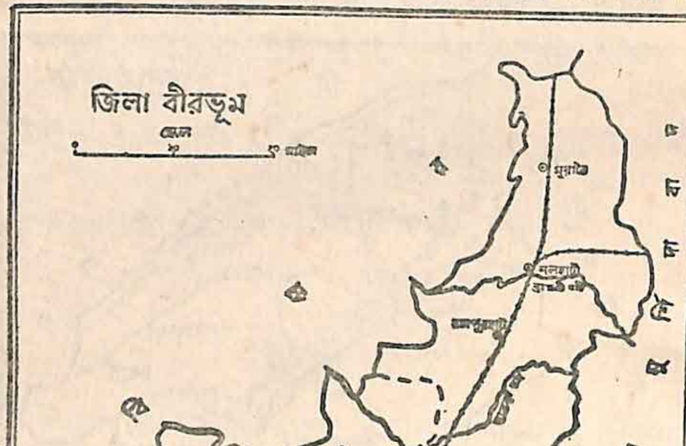
মহকুমা—এই জেলায় দুটি মহকুমা—বাঁকুড়া (সদর) আর বিষ্ণুপুর।



শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—বাঁকুড়া এই জেলার সদর শহর। **বিষ্ণুপুর** মহকুমা-শহর; রেশমের কাপড়, পিতল-কাঁসার বাসন আর তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে মল্ল রাজাদের রাজধানীর অনেক পুরান মন্দির ইত্যাদি রয়েছে। **সোনামুখী** আর **খাতরা** গালা-শিল্পের জন্য বিখ্যাত। **জয়রামবাটী** শ্রীশ্রীমা সারদামণির জন্মস্থান।

(৫) বীরভূম জেলা

সীমা আর আয়তন—উত্তরে বিহার রাজ্য ও মুর্শিদাবাদ জেলা, পূর্বে মুর্শিদাবাদ আর বর্ধমান জেলা; দক্ষিণে অজয় নদ আর তার অপর পারে



বর্ধমান জেলা, পশ্চিমে বিহার রাজ্য। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আয়তন ১৭৫৭ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ছিল ১৪ লক্ষ ৪৬ হাজারের কিছু বেশী।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—এই জেলার মাটি সাধারণত লাল, পশ্চিমদিকের অঞ্চল পাথুরে আর উঁচুনিচু; ছোট ছোট পাহাড়ও দেখা যায়। ঐসব অঞ্চলে সাঁওতাল, মুন্ডা ইত্যাদি আদিবাসী দেখা যায়।

ব্রাহ্মণী, **দ্বারকা**, **ময়ূরাক্ষী** আর **বক্রেশ্বর** এখানকার প্রধান নদনদী।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, কলাই, আখ, আলু ইত্যাদি এখানকার প্রধান ফসল। এই জেলাতে গমও হয়। ঠিক সময়মতো আর যতটা দরকার ততটা বৃষ্টি হয় না বলে ফসলের প্রায়ই ক্ষতি হয়। এইজন্য সিউড়ি শহর থেকে প্রায় কুড়ি মাইল উত্তর-পশ্চিমে বিহারের সাঁওতাল পরগনায় **মেসাঞ্জোরে** ময়ূরাক্ষী নদীর উপর বিরাট্ এক বাঁধ দিয়ে বর্ষাকালে অনেক জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সিউড়ির উত্তর-পশ্চিমে **তিলপাড়ায়** ময়ূরাক্ষী নদীতে একটা ব্যারাজ (কপাট-বাঁধ) তৈরি করা হয়েছে। এর সঙ্গে রয়েছে সেচ করার খাল আর তার শাখাগুলির যোগাযোগ। এই বাঁধ আর ব্যারাজের সাহায্যে বীরভূম, বর্ধমান আর মুর্শিদাবাদ জেলার কিছু অংশে চাষের জন্য জল সরবরাহ করা হয়।

মহকুমা—এই জেলায় দুটি মহকুমা আছে—সিউড়ি আর রামপুরহাট।

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—জেলার সদর শহর **সিউড়ি**—ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। **রামপুরহাট** মহকুমার প্রধান শহর; রামপুরহাট আর **বোলপুর** ধান-চাল কারবারের জন্য বিখ্যাত। **সাঁইথিয়া** এই জেলার প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। **আহম্মদপুরে** চিনির কল আছে। **ইলামবাজার** গালা-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। **নান্নুর** কবি চণ্ডীদাসের আর **কেন্দুবিল্ব** কবি জয়দেবের জন্মস্থান। বোলপুরের কাছে **শান্তিনিকেতন**—এখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত আশ্রম আর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

(৬) পুরুলিয়া জেলা

পুরুলিয়া জেলা অঞ্চল আগে বিহারের মানভূম জেলার মধ্যে ছিল। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর থেকে এখানকার বাংলাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের ভেতর চলে এসেছে। এটা এখন একটা আলাদা জেলা।



সীমা আর আয়তন—উত্তরে বর্ধমান জেলা আর বিহার রাজ্য, পূর্বে বাঁকুড়া আর মেদিনীপুর জেলা; দক্ষিণে বিহার রাজ্য, পশ্চিমেও

বিহার রাজ্য। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আয়তন ২৪৯৫ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার। পশ্চিমবঙ্গের এই জেলায় সবচেয়ে বেশী আদিবাসীর বাস—এদের মধ্যে সাঁওতালই বেশী।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—এই জেলার জমিও উঁচুনিচু, যেন ঢেউ খেলান আর মাটিতে কাঁকর প্রচুর। মাঝে মাঝে পাহাড় আছে—এদের মধ্যে বাগমুণ্ডী পাহাড়শ্রেণীর অযোধ্যা পাহাড় উল্লেখ করার মতো। গজবুরু পাহাড়ের চূড়া ২২২০ ফুট উঁচু। জেলার উত্তর-পূর্বদিকে পঞ্চকোট বা পাঞ্চেৎ পাহাড় আছে। এই জেলার অনেক জায়গায় বন-জঙ্গল আছে। দামোদর, দ্বারকেশ্বর, কাঁসাই, শিলাই, কুমারী আর সুবর্ণরেখা এই জেলার প্রধান নদ বা নদী।

উৎপন্ন দ্রব্য—এই জেলায় বৃষ্টিপাত কম হয়, জমিও চাষবাসের পক্ষে বিশেষ ভাল নয়। এইজন্য শস্য বিশেষ জন্মায় না। গাছপালাও কম। ধানই প্রধান ফসল। বন থেকে অনেক মধু পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে কিছু খনিজ জিনিসও পাওয়া যায়—পঞ্চকোটের কাছে কয়লা, বাগমুণ্ডী আর বরাহভূমে আকরিক লোহা। আদিবাসীরা এখনও আকরিক লোহা থেকে লোহা বার করে তা দিয়ে গৃহস্থালির জিনিসপত্র, যেমন দা, হাতা, খুন্তি ইত্যাদি তৈরি করে।

শিল্প—এই জেলায় শাল, কুসুম, পলাশ, কুল ইত্যাদি গাছের বন যথেষ্ট রয়েছে। এসব গাছে লাক্ষাকীট পালন করা হয় আর ঐ কীট থেকে গাছের উপর জমাট লাক্ষা পাওয়া যায়। লাক্ষা থেকে গালা তৈরি করার জন্য অনেক জায়গায় গালার কারখানা আছে। ঝালদা, বলরামপুর ইত্যাদি জায়গায় প্রসিদ্ধ গালার কারখানা আছে। রঘুনাথপুর আর আশেপাশের জায়গা তসর-শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

মহকুমা—এই জেলার একটি মাত্র মহকুমা—পুরুলিয়া।

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—পুরুলিয়া, মহকুমা আর জেলার সদর, ব্যবসা-বাণিজ্য আর ভাল জলহাওয়ার জন্য বিখ্যাত। আদ্রা একটা বড়

রেল-জংশন। এই জেলার উত্তর-পূর্বদিকে দামোদরের উপর খুব বড় **পাঞ্চেৎ বাঁধ** তৈরি করা হয়েছে।

যাতায়াত—এই জেলায় রাস্তা বা রেলপথ কিভাবে আছে মানচিত্রে বা ছবিতে দেখ।

পুরুলিয়া জেলায় জলের অভাব খুব বেশী। কংসাবতী নদীতে বাঁধ দেওয়া হলে এখানে চাষবাসের অবস্থা ভাল হবে আশা করা যায়।

জলপাইগুড়ি বিভাগ : এই বিভাগের ৫টি জেলা সম্বন্ধে ভৌগোলিক বিবরণ নিচে দেওয়া হল।

(১) মালদহ জেলা

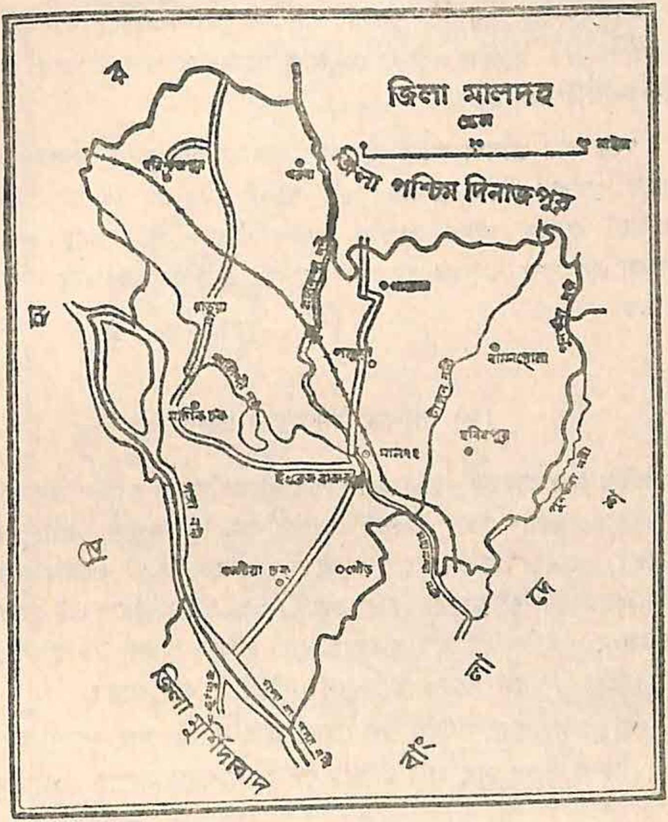
সীমা আর আয়তন—এই জেলার উত্তরে বিহার রাজ্য আর পশ্চিম দিনাজপুর জেলা, পূর্বদিকে বাংলা দেশ আর পশ্চিমে বিহার রাজ্য। ১৯৬১ খিস্টাব্দের হিসাবে এই জেলার আয়তন ১৪৩৬ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ২২ হাজারের কাছাকাছি। এই জেলায় জায়গায় জায়গায় আদিবাসী সাঁওতালরা বাস করে।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—**গংগা, কালিন্দী, মহানন্দা, টাংগন** আর **পুনর্ভবা** এই জেলার প্রধান প্রধান নদী। মহানন্দা নদীর পূর্বদিকের জমি সাধারণত উঁচুনিচু আর পশ্চিমদিকের জমি অপেক্ষাকৃত সমতল আর ফসল জন্মাবার পক্ষে ভাল।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, গম, ভুট্টা, ডাল, তৈলবীজ। এখানকার আম বিখ্যাত। তুঁতের চাষ করে রেশম-পোকা পালন আর রেশম তৈরী এই জেলার মতো অন্য জেলায় হয় না।

যাতায়াত—একটি রাস্তা কলকাতা থেকে চব্বিশ পরগনা আর নদীয়া জেলা হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলায় গংগার ধার অবধি গিয়েছে। অন্যপারে

ঐ রাস্তা পশ্চিম দিনাজপুর জেলার ভিতর দিয়ে দার্জিলিং জেলা পর্যন্ত গিয়েছে।



রেলপথে ঐ অঞ্চলে যেতে গেলে বর্ধমান-নলহাটি পথে বিহারের সকরিগলি ঘাট যেতে হয়। সেখানে স্টীমারে গঙ্গা পার হয়ে মণিহারি ঘাট আর তারপর রেলপথে কাটিহার জংশন হয়ে দার্জিলিং জেলার

শিলিগুড়ি যাওয়া যায়। কাটিহার থেকে একটা শাখা রেলপথ মালদহ গিয়েছে। আর এক শাখা পশ্চিম দিনাজপুর জেলায় গিয়েছে।

মহকুমা—এই জেলার একটি মাত্র মহকুমা—**মালদহ**; এর সদর ইংরাজবাজার। মালদহ শহরের যে অংশ মহানন্দার পশ্চিম পারে তাকে ইংরাজবাজার বলা হয়।

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—**ইংরাজবাজার** জেলার সদর; রেশম আর আমের ব্যবসার প্রধান জায়গা। এই জেলায় বাংলার বিখ্যাত পুরান রাজধানী গৌড়ে অনেক প্রাচীন ভাংগা দালান-কোঠা পড়ে আছে। **পাণ্ডুয়া** এক সময় বাংলার রাজধানী ছিল। এখানকার আদিনা মসজিদ বিখ্যাত।

(২) পশ্চিম দিনাজপুর জেলা

সীমা আর আয়তন—১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশবিভাগের ফলে আগেকার দিনাজপুর জেলার কিছু অংশ নিয়ে পশ্চিম দিনাজপুর জেলা গড়ে উঠেছে। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর থেকে বিহার রাজ্যের ৭৪০ বর্গমাইল জায়গা এই জেলার ভিতর আসে। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে এই জেলার আয়তন ২০৫২ বর্গমাইল আর লোকসংখ্যা প্রায় ১৩ লক্ষ ২৪ হাজারের কাছাকাছি। এখানে অনেক আদিবাসী সাঁওতাল বাস করে।

এই জেলার উত্তরে দার্জিলিং জেলা আর বাংলা দেশ, পূর্বে বাংলা দেশ, দক্ষিণে বাংলা দেশ আর মালদহ জেলা, পশ্চিমে মালদহ জেলা আর বিহার রাজ্য।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—**মহানন্দা, নাগর, কুলিক, গামর, টাংগন, পুনর্ভবা, আত্রাই** প্রভৃতি নদ আর নদী এই জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। খাল, বিল আর পুকুর প্রচুর রয়েছে এই জেলায়।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, তামাক আর তৈলবীজ এই জেলার প্রধান ফসল।



মহকুমা—বালুরঘাট (সদর), রায়গঞ্জ আর ইসলামপুর এই জেলার তিন মহকুমা।

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—জেলার সদর শহর হল বালুরঘাট। রায়গঞ্জ মহকুমা-শহর, ধান আর পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত।

ইসলামপুর মহকুমা-শহর আর ব্যবসা কেন্দ্র। **হিলি** ধান, পাট, আখ, সরষে ইত্যাদি কৃষিজাত জিনিসের বাণিজ্যস্থান। **পাঁজিপাড়া** আর **ডালকোলা** পাটের কারবারের জন্য বিখ্যাত। **বাণগড়ে** খুব পুরান দিনের কীর্তির চিহ্ন আছে। ইতিহাসে বিখ্যাত **মহীপাল দিঘি** কুশমণ্ডি থানার মধ্যে অবস্থিত।

যাতায়াত—জেলার মানচিত্রে রেলপথ আর রাস্তা ভাল করে দেখ। কালিয়াগঞ্জ রেল স্টেশন থেকে মোটর বাসে বালুরঘাটে যেতে হয়।

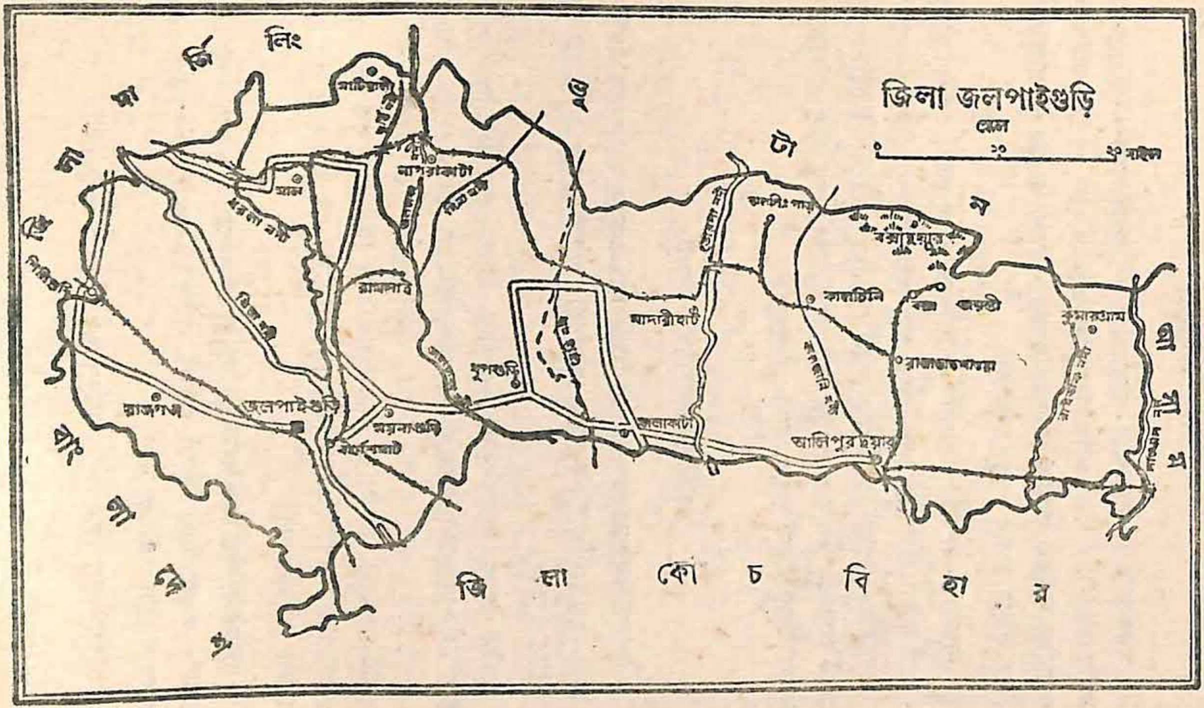
(৩) জলপাইগুড়ি জেলা

সীমা আর আয়তন—উত্তরে দার্জিলিং জেলা আর ভুটান রাজ্য; পূর্বে আসাম, দক্ষিণে কোচবিহার আর বাংলা দেশ, পশ্চিমে দার্জিলিং জেলা। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে আয়তন ২৪০৭ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ১৩ লক্ষ ৫৯ হাজারের কিছু বেশী। এই জেলায় নেপালী, ভুটিয়া, রাজবংশী, মেচ্ প্রভৃতি জাতের লোকও আছে।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—তিস্তা, জলঢাকা, তোর্সা, কালজানি, রায়ডাক, সংকোশ প্রধান নদ বা নদী। জেলার উত্তর-পূর্বদিকে পাহাড় আর সেইদিক্ দিয়েই ভুটান রাজ্যে ঢোকবার রাস্তা। তিস্তা নদীর পশ্চিম দিকের অঞ্চলকে তরাই আর পূর্বদিকের অঞ্চলকে ডুয়ার্স বলে। উত্তর-পূর্ব ডুয়ার্স অঞ্চল ঘোর জঙ্গল; এখানে হাতি, বাঘ, বুনো মোষ, হরিণ ইত্যাদি জন্তু আছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, ডাল, আখ, তামাক, কমলালেবু, চা ইত্যাদি এখানে উৎপন্ন হয়। চা চাষের আর চা-শিল্পের জন্য এই জেলা বিখ্যাত। বন থেকে প্রচুর শাল, জারুল ইত্যাদি কাঠ পাওয়া যায়।

মহকুমা—জলপাইগুড়ি (সদর) আর আলিপুর ডুয়ার্স এই জেলার দুটি মহকুমা।



জিলা জলপাইগুড়ি
স্কেল
দা র্জি লিং
ভু টা ন
আ সা ম
জি লা কো চ বি হা র
বাং লা দে শ
জলপাইগুড়ি
আলিপুর দুয়ার
কালচিনি
মাদারীহাট
রাজগঞ্জ
ময়নাগুড়ি
ধূপগুড়ি
নাগরাকাটা
কুমারগ্রাম
রাজাভাতখাওয়া
তিস্তা নদী
জলঢাকা নদী

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—জলপাইগুড়ি জেলার সদর শহর, তিস্তা নদীর তীরে অবস্থিত। **আলিপুর-ডুয়ার্স** মহকুমা শহর, চা উৎপাদন আর রপ্তানির কেন্দ্র। **বক্সাতে** সৈন্যদের থাকবার জায়গা আছে। **বক্সা-ডুয়ার্স** দিয়ে ভুটানে যাবার রাস্তা হয়েছে।

যাতায়াত—দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি থেকে রেলে জলপাইগুড়ি যাওয়া যায়। জলপাইগুড়ির অপর পার থেকে রেলে আলিপুর ডুয়ার্স যাওয়া যায়। সেখান থেকে রেল লাইন কোচবিহার গিয়েছে। শিলিগুড়ি থেকে আর এক লাইন জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর দিক্ দিয়ে আলিপুর-ডুয়ার্স হয়ে সেখান থেকে আসাম গিয়েছে।

(৪) কোচবিহার জেলা

ইংরেজ রাজত্বের সময় থেকেই কোচবিহার একজন মহারাজার অধীনে ছিল। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়েছে।

সীমা আর আয়তন—এই জেলার উত্তরে জলপাইগুড়ি জেলা, পূর্বে আসাম রাজ্য আর বাংলা দেশ, দক্ষিণে বাংলা দেশ, পশ্চিমে জলপাইগুড়ি আর বাংলা দেশ। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কোচবিহারের আয়তন ১২৮৯ বর্গমাইল, আর লোকসংখ্যা ছিল প্রায় ১০ লক্ষ ২০ হাজার। এখানকার আদিম অধিবাসী কোচদের নাম অনুসারে এর নাম হয়েছে কোচবিহার।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—উঁচুনিচু আর সমতল জায়গা দুইই এই জেলায় পাওয়া যায়। **তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা, কালজানি, রায়ডাক** আর **সঙ্কোশ** প্রধান নদ বা নদী।

উৎপন্ন দ্রব্য—ধান, পাট, তামাক প্রধান প্রধান ফসল।

মহকুমা—কোচবিহার (সদর), মেকলিগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, দিনহাটা আর তুফানগঞ্জ।

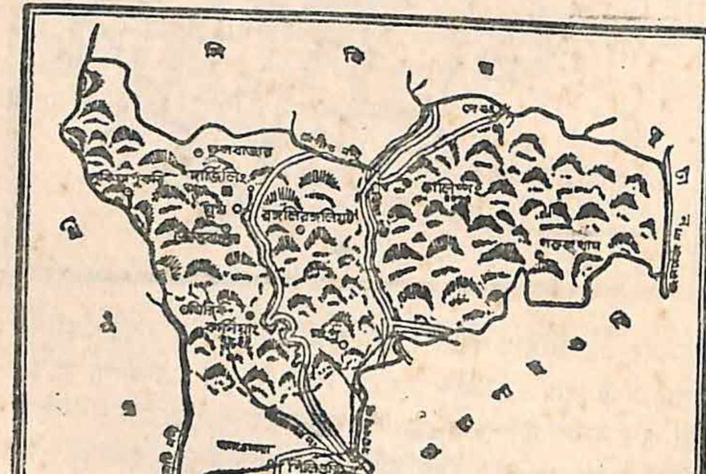


শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—**কোচবিহার** তোর্সা নদীর তীরে অবস্থিত। জেলার সদর আর বাণিজ্যের কেন্দ্র। **দিনহাটা** আর **মাথাভাংগা** মহকুমা-শহর আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। **হলদিবাড়ি** তামাকের জন্য বিখ্যাত; তাছাড়া ব্যবসার কেন্দ্র। **মেকলিগঞ্জ** আর **তুফানগঞ্জ** মহকুমা-শহর আর ব্যবসা-বাণিজ্যের বড় জায়গা।

(৫) দার্জিলিং জেলা

সীমা, আয়তন আর অধিবাসী—এই জেলার উত্তরদিকে সিকিম রাজ্য, পূর্বদিকে ভুটান রাজ্য আর জলপাইগুড়ি জেলা, দক্ষিণে বাংলা দেশ, পশ্চিম দিনাজপুর আর বিহার, পশ্চিমে নেপাল রাজ্য। ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিং জেলার আয়তন ১১৬০ বর্গমাইল আর

লোকসংখ্যা ৬ লক্ষ ২৫ হাজারের কাছাকাছি ছিল। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার তুলনায় এই জেলার লোকসংখ্যা সবথেকে কম। দার্জিলিং জেলায় পাহাড়ী জাতের লোকই বেশী। সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেক নেপালী—এদের পূর্ব-পুরুষেরা ১০০ বছরেরও আগে নেপাল থেকে দার্জিলিংয়ে এসে বসবাস করতে থাকে। এরা ছাড়া লেপচা, ভুটিয়া,



তিব্বতীরা আছে। দার্জিলিং শহরের পাঁচভাগের একভাগ লোক বাংলার সমতল ভূমির লোক আর তাদের ভাষা বাংলা।

ভূমির প্রকৃতি আর নদনদী—এই জেলার বেশির ভাগই হিমালয়ের পাহাড়ী অঞ্চলে। দার্জিলিং শহরও ঐ পাহাড়ের উপর প্রায় সাত হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত। পাহাড়ের নিচের দিকে প্রায় সমতল তরাই অঞ্চল। মেচি, বালাসন, মহানন্দা, তিস্তা, রংগিত, জলঢাকা প্রধান নদী। এসব ছাড়াও জেলার মধ্যে অন্যান্য পার্বত্য নদী আছে। এসব নদীতে বহু ঝরনা আর জলপ্রপাত রয়েছে।

উৎপন্ন দ্রব্য—চা আর কমলালেবু এই জেলায় প্রচুর জন্মায়। পাহাড়ের গায়ে অনেক চা আর কমলালেবুর বাগান আছে। দার্জিলিং-এর চা খুব ভাল জাতের। সেজন্য পৃথিবীর অনেক দেশেই এ চায়ের চাহিদা আছে। পাহাড়ে জায়গায় ভুট্টা, কপি, বীন, মটরশুঁটি ইত্যাদি সবজি আর পাহাড়ের তলার দিকে ধান আর পাটের চাষ হয়। দার্জিলিংয়ের কাছে মংপুতে সিঙ্কোনা গাছের চাষ হয়—এর ছাল থেকে ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন তৈরি হয়। দক্ষিণদিকের তরাই অঞ্চলে শাল, জারুল, বাঁশ প্রভৃতির বন আর উঁচু পাহাড়ে জায়গায় পাইন ইত্যাদি গাছের বন আছে।

মহকুমা—এই জেলার মহকুমা চারটি—দার্জিলিং, কার্শিয়াং, কালিম্পং আর শিলিগুড়ি।

শহর আর প্রসিদ্ধ স্থান—জেলার সদর শহর দার্জিলিং। অনেক উঁচুতে অবস্থিত বলে এখানে বার মাসই শীত। গরমের দিনেও দার্জিলিং শীতকালের কলকাতা থেকে ঠাণ্ডা। এখানে স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল গ্রীষ্মের সময় এখানে এসে থাকেন—রাজ্যপালের জন্য সুন্দর একটি ভবন আছে। এখানকার দৃশ্য খুব সুন্দর। বিরাট্ কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়া এখান থেকে দেখা যায়। নানা দেশ থেকে বহুলোক দার্জিলিং বেড়াতে আসে। **কার্শিয়াং** আর **কালিম্পং** মহকুমা-শহর ও স্বাস্থ্যকর জায়গা। কালিম্পং তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত

ছিল। শিলিগুড়ি মহকুমা-শহর, মহানন্দা নদীর ধারের একটি রেল স্টেশন আর বাণিজ্যের জায়গা।

যাতায়াত—শিলিগুড়ি থেকে একটা ছোট রেল লাইন এঁকেবেঁকে পাহাড়ের গা বেয়ে দার্জিলিং পর্যন্ত গিয়েছে। তাছাড়া এখান থেকে খুব ভাল রাস্তা দার্জিলিং পর্যন্ত গিয়েছে। মোটরগাড়ি করে তাড়াতাড়ি দার্জিলিং পৌঁছান যায়। কালিম্পংও মোটর গাড়ি করে যাওয়া যায়। এখান থেকে সিকিম যাওয়া যায়। বাগডোগরায় বিমানবন্দর আছে।

উত্তর লেখ

১। তুমি যে জেলায় থাক তার মানচিত্র এঁকে পাহাড়, নদনদী, মহকুমার সীমা, রেললাইন, বড় বড় রাস্তা, প্রসিদ্ধ শহর বা গ্রাম দেখাও। তোমার নিজের গ্রাম বা শহর দেখাও। মহকুমা রঙ করে দেখাও।

২। তোমরা যে জেলায় থাক সে জেলার সম্বন্ধে যা জান লেখ। বইয়ে যা লেখা আছে তাছাড়া যদি কিছু জানা থাকে লেখ।

৩। তোমার জেলা থেকে নিচের জায়গাগুলিতে যেতে হলে সব থেকে কম দূরত্বের পথ কি কি লেখ:—

বিহার, উড়িষ্যা, নেপাল, সিকিম, ভুটান, বাংলা দেশ।

৪। কোন্ কোন্ জেলায় এইসব জিনিসের চাষ বেশী হয়—ধান, গম, চা, ডাল, নারকেল, আলু, আম, কমলালেবু?

৫। কোন্ কোন্ জেলায় মধু, জ্বালানী-কাঠ ও লাক্ষা বেশী পাওয়া যায়?

৬। কোন্ কোন্ জেলায় কি কি খনিজ শিল্প, যন্ত্রশিল্প আর কুটির-শিল্পের প্রচলন বেশী?

৭। নিম্নলিখিত জায়গাগুলি কোথায় আর কিসের জন্য বিখ্যাত লেখ—কলকাতা, হাওড়া, আলিপুর, সুন্দরবন, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর, গৌড়, হলদিবাড়ি, বক্সা, দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার, শ্রীরামপুর, কামারপুকুর, রানীগঞ্জ, বার্নপুর, দুর্গাপুর, কল্যাণী, চিত্তরঞ্জন, খড়্গপুর, তমলুক, দিঘা, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট, শান্তিনিকেতন, আদ্রা ও রঘুনাথপুর।

৬

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যারা বসবাস করে

আমরা পশ্চিমবঙ্গে বাস করি; আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমরা বাঙালী বলে পরিচিত। পশ্চিমবঙ্গের জমি ফল-ফসল জন্মানর পক্ষে খুব ভাল, বৃষ্টিও হয় মোটামুটি ভাল। জলবায়ু বেশী গরম নয়, আবার খুব ঠাণ্ডাও নয়। ধানই প্রধান ফসল। বাংলাদেশের বেশির ভাগ লোকই চাষ আর নানারকমের শিল্পের কাজ করে থাকে। বহুলোক চাকরিও করে। বাঙালীরা সাধারণত ধুতি, জামা আর অনেক সময় চাদরও ব্যবহার করে।



বাঙালী

পশ্চিমবাংলা ভারতের পূর্বদিকের এক রাজ্য। মানচিত্রে দেখবে আসাম, বিহার, আর উড়িষ্যাও ভারতের পূর্বদিকে। এই চারটি রাজ্য ছাড়াও ভারতে উত্তর-প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই, গুজরাট, রাজস্থান, পঞ্জাব ও হরিয়ানা (সম্প্রতি গঠিত), কাশ্মীর, অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরালা প্রভৃতি রাজ্য রয়েছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যারা বসবাস করে তাদের ভাষা, চেহারা আর আচার-ব্যবহার এক রকমের নয়। রাজ্যগুলির জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিভিন্ন রকমের বলে অধিবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি খাওয়া-দাওয়ার

মধ্যেও পার্থক্য দেখা যায়। এখন যেসব অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের অনেক পার্থক্য রয়েছে তাদের কথা বলা হচ্ছে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসী

পঞ্জাব—ভারতের উত্তর-পশ্চিম অংশে পঞ্জাব রাজ্য। এই রাজ্যে যারা বসবাস করে তাদের **পঞ্জাবী** বলা হয়।

পঞ্জাবীরা বেশ লম্বা-চওড়া। পুরুষেরা সাধারণত পায়জামা পরে আর লম্বা শার্ট বা পাঞ্জাবি গায়ে দেয়। মেয়েদের পোশাক রঙিন শালোয়ার, লম্বা ঝুলের কামিজ আর ওড়না।

পঞ্জাবে গ্রীষ্মকালে গরম খুব বেশী, আবার শীতকালে শীতও খুব প্রচণ্ড। এখানে প্রচুর গম জন্মায়। রুটি আর মাংস পঞ্জাবীদের প্রধান খাদ্য। এদের মধ্যে অনেকেই চাষবাস বা শিল্পের কাজ করে। শিক্ষিত পঞ্জাবীরা চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদি করে থাকেন। পঞ্জাবীরা সাহসী আর যুদ্ধ-বিদ্যায় কুশলী।



পঞ্জাবী

পঞ্জাবীদের মধ্যে হিন্দু আর শিখ দুই ধর্মের লোকই বেশী দেখা যায়। ধর্মের নিয়মমত শিখেরা চুল আর দাড়ি রাখে; লম্বা চুলে থাকে একখানা চিরুনি, আর হাতে লোহার বালা, কোমরে কৃপাণ। পঞ্জাবীরা মাথায় পাগড়ি বাঁধে।

কাশ্মীর—পঞ্জাবের উত্তরে কাশ্মীর রাজ্য। এর বেশির ভাগই পাহাড়ে উঁচু জমি। গরমের সময় গরম খুবই কম থাকে। বছরের ছয় মাসের উপর বেশ শীত। এখানকার লোকেরা দেখতে ফরসা আর



কাশ্মীরী



রাজপুত

সুন্দর। কাশ্মীরে থাকে বলে এ'দের কাশ্মীরী বলা হয়। কাশ্মীরী পুরুষেরা পায়জামা লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি আর শাল পরে; মাথায় পাগড়ি বা টুপি পরে। মেয়েরা রঙিন শালোয়ার, রঙিন কামিজ আর

ওড়না পরে। ভেড়া বা ছাগলের লোম থেকে শাল বা অন্যান্য গরমের জামা কাপড় আর গালচে এখানে তৈরী হয়।

গম, যব, ধান, আপেল, পীচ্, আঙুর, আখরোট, এই রাজ্যের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। কাশ্মীর খুব সুন্দর জায়গা; জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর।

রাজপুত—উত্তর-পশ্চিম অংশে রাজস্থান ভারতের আর একটা রাজ্য। এখানকার বাসিন্দাদের বলা হয় রাজপুত। রাজস্থানের পশ্চিম-দিকে 'থর' নামে খুব বড় মরুভূমি আছে। পূর্বদিকেও বৃষ্টি কম হয়; কুয়া আর খাল থেকে জল সেচ করে গম, জোয়ার, বজরা, ইত্যাদি ফসল জন্মান হয়। রুটি, ডাল আর শাক-সবজি রাজপুতদের প্রধান খাদ্য। এদের অনেকেরই রঙ বেশ ফরসা। পুরুষরা চুড়িদার পায়জামা বা ধুতি আর শেরোয়ানী ধরনের জামা পরে; মাথায় থাকে রঙিন পাগড়ি। মেয়েদের পরনে থাকে রঙিন ঘাঘরা বা শাড়ি, কামিজ আর ওড়না; হাতে আর পায়ে মোটা মোটা সোনা বা রুপোর গয়না।

পঞ্জাবীদের মতো রাজপুতরাও সাহসী আর যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী। রাজস্থানের অনেক লোক আমাদের সৈন্যবাহিনীতে আছে। রাজপুতরা প্রধানত জৈন ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী। জৈনরা মাছ-মাংস ইত্যাদি খায় না, জীবহত্যাও করে না।

তোমরা শহরে এমনকি গ্রামেও মাড়োয়ারীদের দেখতে পাও—এরাও রাজস্থানের লোক। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকেই এদের ঝোঁক বেশী।

দক্ষিণ ভারতের অধিবাসী

পঞ্জাবী, কাশ্মীরী, রাজপুত ইত্যাদি যাদের সম্বন্ধে বলা হল, তারা সকলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের লোক। এখন দক্ষিণ ভারতের লোকেদের কথা বলা হচ্ছে। এরা অন্ধ্র, মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরালা ইত্যাদি রাজ্যে

বাস করে। মাদ্রাজের লোকদের কথা জানলে দক্ষিণ ভারতের লোকদের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করতে পারবে।

মাদ্রাজী—ভারতের একেবারে দক্ষিণদিকে মাদ্রাজ রাজ্য। এই জায়গায় যারা বসবাস করে তাদের মাদ্রাজী বলা হয়। এদের ভাষা তামিল। মাদ্রাজীদের চেহারা খুব লম্বা-চওড়া হয় না। গায়ের রঙ সাধারণত কাল। ব্রাহ্মণদের কপালে তিলক দেখা যায়। এদের কাপড় পরবার ধরনও আমাদের মতো নয়। একখানা কাপড় ভাঁজ করে লুঙ্গির মতো করে পরে, কাঁধে একখানা চাদর পাট করে রাখে আর চপ্পল পায়ে দেয়। মাদ্রাজীদের মাথায় পাগড়ি বাঁধার রীতি আছে। মেয়েদের রঙ-বেরঙ-এর শাড়ি কাছা দিয়ে পরতে দেখা যায়। এখানকার জলহাওয়া একটু গরম; সেই জন্য মোটা বা গরম কাপড়-জামা পরার দরকার হয় না। মাদ্রাজে গ্রীষ্মকালে আর শীত-কালেও বৃষ্টি হয়। ধান, আখ, নারকেল, চীনাবাদাম ইত্যাদিই বেশী হয়। এখানকার লোকেরা ভাত, ডাল আর তরকারি খায়। তবে এরা টক, দুধ, ঘোল ইত্যাদি বেশী পছন্দ করে। এদের মধ্যে অনেক লোকই নিরামিষ খায়। মাদ্রাজীরা নারকেল তেল ব্যবহার করে বেশী। নানারকমের শিল্পে বা চাকরিতে মাদ্রাজীরা কৃতিত্বের পরিচয় দেয়।



মাদ্রাজী

নেপালী—পশ্চিমবঙ্গের উত্তর-পশ্চিমে হিমালয় পাহাড়ের মধ্যে স্বাধীন নেপাল রাজ্য। এখানকার বাসিন্দাদের নেপালী বলে। প্রায় ১০০ বছর আগে দার্জিলিং শহর গড়ে উঠার সময় অনেক নেপালী ব্যবসা-বাণিজ্য বা চাকরির জন্য দার্জিলিংয়ে এসে বসবাস শুরু করে। এখানে অন্য পাহাড়ী জাতও আছে —যেমন, ভুটিয়া, লেপচা প্রভৃতি। এদের নাক একটু চ্যাপ্টা, চোখ অপেক্ষাকৃত ছোট আর টানা। নেপালীদের চেহারায় এইরকম ভাব কম। কোন কোন নেপালীর রঙ বেশ ফরসা আর নাক উঁচু—এরা সাধারণত বড় ঘরের নেপালী। সাধারণত নেপালীরা পায়জামা, কোট আর টুপি পরে। যারা পাহারার কাজ করে তাদের কোমরে বেল্টের সঙ্গে ভোজালি বা কুক্রি ঝোলান থাকে। নেপালী মেয়েরা রঙিন ঘাঘরা, শাড়ি, কামিজ, ওড়না ইত্যাদি ব্যবহার করে। এদের গায়ে মোটাসোটা রুপোর বা সোনার গয়না দেখা যায়। নেপালীরা শীতের জায়গায় বেশী থাকে বলে গরম পোশাকই বেশী পরে।



নেপালী পাহারাওয়ালা

দার্জিলিংয়ের পাহাড়ী জাতিদের মধ্যে এরা বেশী শিক্ষিত আর উন্নত। এদের গুর্খা শ্রেণীর লোকেরা চেহারায় ছোট, গঠনে মজবুত, খুব সাহসী আর বিশ্বাসী হয়। এদের অনেকে সৈন্যবাহিনীতে কাজ নিয়ে থাকে। যুদ্ধ করতে এরা খুব পটু

তার জন্য এদের নামও পৃথিবীর সবদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সাধারণ নেপালীরা চাষ-আবাদ, কুটির-শিল্প আর চা-বাগানের কাজ করে। নেপালীরা প্রায় সবাই হিন্দু। এরা রুটি, ভাত, ডাল, মাছ, মাংস ইত্যাদি খায়। কাঠমণ্ডু নেপালের রাজধানী।

খাসিয়া—ভারতের উত্তর-পূর্বদিকে আসাম রাজ্য। শিলং ঐ অঞ্চলের প্রধান শহর। এই রাজ্যের খাসিয়া আর জয়ন্তিয়া পাহাড়



খাসিয়া পুরুষ

অঞ্চলে এক জাতির লোক বসবাস করে—এদের বলা হয় খাসিয়া। এদের গায়ের রঙ ফরসা, নাক চ্যাপ্টা আর চোখ টানা। পুরুষদের মুখে গোঁফ-দাড়ি কম হয়।

শীতের জায়গা বলে এদের প্রায় সব সময়েই গরমের জামা-কাপড় পরতে হয়। পুরুষেরা পায়জামা, প্যান্ট বা জামা পরে থাকে। মাথায় প্রায় সকলেরই পাগড়ি থাকে। মেয়েরা বুকের উপর পর্যন্ত একখানা

কাপড় বা ঘাঘরা লুঙ্গির মতো করে পরে। তারপর একখানা চাদর কাঁধের উপর দিয়ে সামনে আর পেছনে ঝুলিয়ে দেয়; মাথায় অনেক সময় ওড়না থাকে।

খাসিয়ারা খুব পরিশ্রমী; অনেক সময় পুরুষদের চাইতে মেয়েরা বেশী পরিশ্রমের কাজ করে। তারা হাটবাজার করে, দোকান চালায়, চাষের কাজে সাহায্য করে আর সংসারেরও কাজ করে। কাজেই এদের সমাজে, মেয়েদের ক্ষমতা অনেক। খাসিয়ারা অনেকে ভূত, প্রেত, গাছ, পাহাড় ইত্যাদির পূজা করে। এদের মধ্যে অনেকে আবার খিস্টধর্ম নিয়েছে। এরা ভাত, প্রায় সব রকমের মাংস, শুকনো মাছ, ফল ইত্যাদি খায়।



মুণ্ডা শ্রমিক

মুণ্ডা—বিহারের ছোটনাগপুরের পাহাড়ে জায়গায় নানা আদিম জাতির লোক বসবাস করে। এরা ভারতের খুব পুরান বাসিন্দাদের বংশধর—এইজন্যই এদের আদিবাসী বলা হয়। এদের মধ্যে কিছু কিছু লোক এখনও বনে-জঙ্গলে ফলমূল যোগাড় করে, জন্তু-জানোয়ার মেরে খাদ্য যোগাড় করে। আহার্যের খোঁজে এরা কাঠ, কুড়ুল, তীর-ধনুক নিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। এদের এখনও সভ্য বলা চলে না। অনেকে এদের বুনো বলে থাকে।

এই বুনোদের চেয়ে আরও একটু উঁচু স্তরে রয়েছে ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি। এরা অনেক দিন থেকে চাষবাস করতে জানে, কয়েক ঘর মিলেমিশে স্থায়িভাবে এক গ্রামে বসবাস করে, আর কয়েকরকম ফসলের চাষ-আবাদ জানে। যেখানে এদের নিজস্ব গ্রাম আছে সেখানে তারা গ্রামের মোড়ল, আর পুরুত ঠিক করে নিয়ে তাদের সাহায্যে গ্রামের শাসন চালায়। রোগ সারাবার জন্য প্রত্যেক গ্রামে একজন করে ওঝা থাকে।

মুণ্ডারা রাঁচি এলাকায় খুব প্রাচীন কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এদের রঙ কাল। এরা বেশ বলিষ্ঠ। যেসব ভূত বা অপদেবতা মানুষের ক্ষতি করে বলে এদের বিশ্বাস তাদের শান্ত করার জন্য এরা পূজা করে। এদের কিছু লোক খ্রিস্টান হয়েছে। বাংলাদেশে চৈত্র মাসে যে গাজনের উৎসব হয়, রাঁচির ওঁরাও বা মুণ্ডারা জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে সেইরকম উৎসব করে থাকে। এরা সাধারণ কাপড়-চোপড় পরে; তবে ছেলেরা বেশী বয়স পর্যন্ত হাতে আর গলায় গয়না পরে। তীর-ধনুক দিয়ে শিকার করতে এরা খুব ভাল পারে। মুণ্ডারা নাচ-গান খুব ভালবাসে। এদের মধ্যে খুব একতার ভাব আছে। এরা এক-রকম দেশী মদ তৈরি করতে জানে; পাল-পার্বণে সেই মদ খায়। এরা সরল, সত্যকথা বলে, সাহসী আর বিশ্বাসী। এরা মুণ্ডা ভাষায় কথা বলে; মৃতদেহ কবরে দেয়। এখন এদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ বেশ দেখা দিয়েছে।

সাঁওতাল—বিহার-বাংলার পাহাড়ে জায়গায় সাঁওতালরা তাদের সহজ সরল জীবন আনন্দে কাটাত। ঐসব পাহাড় বা বনে-জঙ্গলে খাবারের অভাব হওয়ায় এরা নিচের সমতল জায়গায় নেমে আসে। এখন বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগনায় আর পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর আর মালদহ জেলায় সাঁওতালদের বসতি রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকে এখন চাষ-আবাদ, দিন-মজুরি আর কল-কারখানায়

কাজ করে। এরা সাঁওতালী ভাষায় কথা বলে। এদের মধ্যেও লেখাপড়া শেখার খুব আগ্রহ দেখা দিয়েছে।

সাঁওতালদের বাড়িঘর বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন—কাজেই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। পুরুষদের পোশাক সাদা-সিধে, এরা হাতে বালা, কানে আংটি পরতে ভালবাসে। মেয়েদের ভাল পোশাক লাল চওড়া-পাড় শাড়ি। মাথার চুল পিছন দিকে টেনে বেঁধে সাঁওতাল মেয়েরা খোঁপায় ফুল পরতে খুব ভালবাসে। বসন্তের শুক্লপক্ষে চাঁদের আলোয় সাঁওতালরা মাদল নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত খোলা মাঠে নাচগান করে। প্রায় গোল হয়ে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে সাঁওতাল মেয়েরা নাচে, মাঝে মাঝে গান করে। সামনে একজন পুরুষ বাঁশি আর একজন মাদল বাজায়। সারা বছর ধরেই এরা উৎসব করে।



সাঁওতাল শিকারী

বিয়ের উৎসবের সময় বরপক্ষের লোকেরা নাচতে নাচতে গ্রামে ঢোকে—হাতে থাকে ঢাল আর লাঠি বা তরোয়াল, মাথায় পাগড়িতে ময়ূরের পালক গোঁজা। আদিমযুগে এরা কনেকে কেড়ে এনে বিয়ে করত—সেই প্রথাই কিছুটা রয়ে গেছে এখনও।

এদের বিশ্বাস কতকগুলি ভূত বা অপদেবতা রোগ ছড়ায়, দুর্ভিক্ষ ঘটায়, আরও অনেক রকমে মানুষের অনিষ্ট করে। এইসব অপদেবতা-

দের সন্তুষ্ট করার জন্য এরা মুরগী বলি দেয় আর মদ নিবেদন করে। উৎসবের সময় সাঁওতালরা মদ খায় কিন্তু মাতাল হয়ে উৎপাত করে না। সাঁওতালরা তাদের মেয়েদের খুব সম্মানের চক্ষে দেখে। কোন পুরুষ কোন মেয়েকে অপমান করলে সেই পুরুষকে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়।

সাঁওতালরা সত্যবাদী, পরিশ্রমী আর বিশ্বাসী। এদের মোড়লরা খুব ভালভাবেই বিচার করে। এদের অভাব সামান্য। গরুবাছুরকে এরা কিভাবে যত্ন করে দেখলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়। এরাও সহজ, সরল আর খুব সুখী। হিন্দুদের মতো এরাও মৃতদেহ পুড়িয়ে ফেলে।

যাযাবর—ভারতের নানা পাহাড়ে বা জঙ্গলে অনেক যাযাবর আছে। একরকমের যাযাবর দেখা যায়—এরা গ্রামে বা শহরে মাঝে মাঝে এসে পুকুর বা নদীর ধারে তাঁবু খাটিয়ে কয়েকদিন থাকে, তারপর অন্য জায়গায় চলে যায়। এদের বলা হয় বেদে। বেদে কথার মানে বৈদ্য বা যারা চিকিৎসা করে। এদের কেউ কেউ সাপ ধরে ঝাঁপির মধ্যে পুরে রাখে আর সাপের খেলা দেখিয়ে পয়সা উপায় করে। অনেকে গাছের শিকড়, পশু-পাখির নখ, হাড়, পাখির ঠোঁট, ডানা ইত্যাদি ওষুধ হিসাবে বিক্রি করে। রোগ সারাবার যে তাদের আশ্চর্য ক্ষমতা আছে সেটা বোঝাবার জন্য এরা নানারকম ভেল্কি দেখায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ বাঁদর বা ভালুকের খেলা দেখায়। মেয়ে, ছেলে জন্তু-জানোয়ার নিয়ে এরা এক জায়গায় কিছুদিন থাকে, তারপর সব গুটিয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যায়।

আমাদের মধ্যে কৃষক বা চাষী আর কারখানার শ্রমিক বা কারখানায় যারা কাজ করে তাদের সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার।

চাষী—আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকই চাষী। এদের মধ্যে অনেকেরই নিজের জমি অতি কম বা আদৌ নেই। এইজন্য তারা

অপরের জমি চাষ করে বা জন-মজুর খাটে। যারা ধান, পাট, কলাই, সরষে, তরি-তরকারি চাষ করে তাদের প্রায় সারা বছরই খুব খাটতে হয়। এসব কাজে মেয়েরাও যথেষ্ট সাহায্য করে। চাষীদের জামা-কাপড় বা ঘরবাড়ি খুবই সাধারণ। এদের বেশির ভাগই গরিব। চাষীদের ছেলেমেয়েদের ভেতর প্রাথমিক শিক্ষা প্রসার পাচ্ছে।



কারখানার শ্রমিক

কারখানার শ্রমিক—কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল ইত্যাদি শহরে আর আশে-পাশে অনেক কল-কারখানা আছে। এইসব কল-কারখানায় যারা শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করে তাদের বলা হয় কারখানার শ্রমিক।

চাষ-আবাদের কাজ আমাদের দেশে খুব প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে কিন্তু বড় বড় কল-কারখানা মাত্র দেড়শ বছর আন্দাজ আমাদের দেশে চালু হয়েছে। কলের শ্রমিকদের আর চাষীদের জীবনযাত্রার কোন

মিল নেই। কল-কারখানার কাছে বেশির ভাগ শ্রমিকদের চালাঘরের বস্তিতে ভিড় করে থাকতে দেখা যায়। এদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান প্রতি বছরই গড়ে তোলা হচ্ছে। আর এরা যাতে প্রকৃত শিক্ষা পায় ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করে সে বিষয়ে চেষ্টা চলছে। চাষীরা গরিব হলেও খোলা জায়গায়, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চালাঘরে থাকে। শ্রমিকদেরও সে রকম পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও শৃঙ্খলাবোধ যাতে গড়ে উঠে সেদিকে যত্ন নিতে হবে।

উত্তর লেখ

১। পঞ্জাবী, কাশ্মীরী, রাজস্থানী আর মাদ্রাজীদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

২। পঞ্জাবী, মাদ্রাজী আর বাঙালীদের মধ্যে কি কি পার্থক্য লক্ষ্য করেছ?

৩। সাঁওতাল আর নেপালীদের সম্বন্ধে যা জান লেখ। এদের কি কি গুণ তোমার ভাল লেগেছে?

৪। চাষী আর কারখানার শ্রমিকদের জীবনে কি কি পার্থক্য তুমি লক্ষ্য করেছ?

৫। ভারতের অন্য জায়গার অধিবাসীদের কাছ থেকে বাঙালীরা কি শিখতে পারে বা কি শেখা উচিত?

সমাপ্ত

প্রকৃতি-পরিচয়

বিজ্ঞান

(চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য)

सत्यमेव जयते

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার

বিজ্ঞান

১

শাক-সবজির চাষ

শাক-সবজি বলতে আমরা বুঝি নটে, পালং, লাউ, কুমড়ো, পুঁই, বাঁধাকপি প্রভৃতির পাতা; পেঁয়াজ, রসুন, ওল, কচু, আলু, মুলো, গাজর, শালগম ইত্যাদির মূল অথবা কাণ্ড; ফুলকপি, মোচা, ইত্যাদির ফুল আর ঝিঙে, ঢেঁড়স, বেগুন, পটল, চিচিঙ্গা, শিম, কড়াইশুঁটি, বরবটি, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি গাছের ফল।

কোনো বাগানে বা জমিতে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে যে সব রকমের শাক-সবজি একই সময় হয় না। এইজন্যে বাজারে বছরের নানা সময় নানারকম শাক-সবজির আমদানি হয়।

শাক-সবজির চাষ করতে হলে কোদাল বা লাঙ্গল দিয়ে বাগানের মাটি খুব ভাল করে তৈরি করতে হয়। দোআঁশ মাটিতে সবজির চাষ ভাল হয়। এই মাটি শুকিয়ে গেলে এঁটেল মাটির মতো শক্ত হয়ে যায় না বা বেলে মাটির মতো একেবারে আলগা বা ঝুরঝুরে হয়ে যায় না। এঁটেল মাটিতে জল জমে থাকে বলে গাছের ক্ষতি হয় আর বেলে মাটিতে জল দাঁড়ায় না, কাজেই গাছ জল না পেয়ে ভালভাবে বাড়তে পারে না।

মাটিতে ঠিকমতো গাছের খাবার না থাকলে গাছ বাড়তে পারে না। গোবর, খোল, ছাই ইত্যাদিতে গাছের খাবার থাকে। এসবকে আমরা

সার বলি। দরকার মতো সার মিশিয়ে সবজি চাষের মাটি তৈরি করতে হয় আর ঠিক মতো জল না পেলে গাছ বাড়ে না, গ্রীষ্ম বা শীতকালে, যখন বৃষ্টির জল খুব কম পাওয়া যায়, তখন জলের অভাবে গাছ যাতে না মরে যায় তার জন্যে সবজি-খেতে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। খোলা জায়গায়, আলো-বাতাস আছে এমন জমিতে শাক-সবজির চাষ করা উচিত। শাক-সবজির চাষ হয় একটু উঁচু জমিতে; আর গাছের গোড়ায় জল জমে গাছ যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্যে জল বের হয়ে যাবার পথ রাখতে হয়। ভাল জাতের বীজ বা বিচি হলে শাক-সবজিও ভাল হয়।

নটে শাক, কুমড়ো, লাউ, শসা আর টোমাটো তোমরা সহজেই জন্মাতে পারো। এসবের জন্যে জমিতে বেশী চাষ করতে হয় না, আর এদের যত্ন করাও খুব কষ্টকর নয়। বেগুন, আলু, কপি, লঙ্কা, পটল ইত্যাদি চাষের জন্যে অনেক পরিশ্রম আর এদের কিভাবে চাষ করতে হয় সেটা খুব ভালভাবে জানা দরকার।

শাকজাতীয় আর লতানো গাছ: এইসব গাছ জন্মানোর আগে জমিতে ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রথমে বাড়িতে একটা সারের জায়গা তৈরি করার জন্যে বাড়ির পেছনে একটা বড় গর্ত করে তাতে মাছের আঁশ, কাঁটা, মাংসের হাড়, তরকারির খোসা ইত্যাদি যত নোংরা জিনিস ফেলতে হবে। এইসব জিনিস পচে, মাটির সঙ্গে মিশে খুব ভাল সার হবে। এর নাম কম্পোস্ট সার। এর জন্যে কিছুই খরচা করতে হয় না। এই সার ছাড়া গোবর, খোল, হাড়ের গুঁড়ো ইত্যাদি সারের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

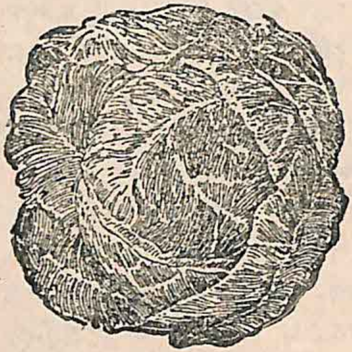
সবজির চাষের জন্যে জমির মাটি কোদাল দিয়ে খুব ভাল করে কুপিয়ে, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো করতে হবে। তারপর জল আর সার দিয়ে সবজির জন্যে ঐ মাটি তৈরি করতে হবে। কোন্ সবজির জন্যে কি সার কতখানি দিতে হবে সেটা যাঁরা জানেন তাঁদের কাছ থেকে জেনে

নিতে হবে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে **নটের** বীজ বুনতে হয়। চৈত্র মাসের শেষের দিকে **কুমড়ো, ঝিঙে, শসা** আর **বরবটির** বীজ পুঁততে হয়। এই সময় ডাঁটার বীজও বুনতে হয়। বর্ষার জল না পাওয়া পর্যন্ত এসব গাছে নিয়মিত জল দিতে হয়। মাঝে মাঝে গাছের গোড়ার মাটি আল্‌গা করে দিতে আর আগাছা জন্মালে তুলে ফেলতে হয়। লতানো গাছ ঘরের চালে বা মাচা বেঁধে উঠিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি বাড়ে। আমাদের দেশে ঘরের উত্তর দিকে ছায়া থাকে, কাজেই লতানো গাছ সেদিকে না লাগানোই ভাল। নটে শাক বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস থেকেই খাওয়ার উপযোগী হয়। ঝিঙের আষাঢ় মাসে আর কুমড়ো, শসা ইত্যাদির শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে ফলন আরম্ভ হয়। শিমের বীজ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে পুঁততে হয়; অগ্রহায়ণ মাস থেকে ফলন আরম্ভ হয়। চারা গজাবার পর থেকে শিম গাছের যত্ন নেওয়া খুব দরকার। প্রথমত বেড়া দিয়ে গরু, ছাগল প্রভৃতির হাত থেকে গাছগুলোকে রক্ষা করতে হবে। তারপর গাছের পোকামাকড় বেছে, পোকা তাড়াবার জন্যে ছাই ছড়িয়ে আর পোকা খাওয়া গাছের ডাল কেটে ফেলে গাছের যত্ন নিতে হবে। নিজের হাতে তৈরী গাছ থেকে যখন কুমড়ো, ঝিঙে, শিম ইত্যাদি তুলতে পারবে তখন কত আনন্দ হবে মনে কর।

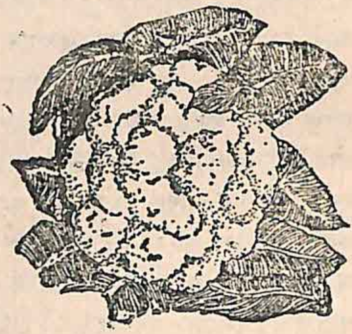
শীতকালের সব্জি : পালং শাক, কপি, গোল আলু, মুলো, কড়াইশুঁটি ইত্যাদি শীতকালের সব্জি। আশ্বিন-কার্তিক মাসে এদের চাষ করতে হয়।

কপি—উঁচু, দোআঁশ মাটিতে কপি ভাল জন্মায়। ভাদ্র মাসে কপির জন্যে গোবর আর খোলের সার দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। ভাদ্র-আশ্বিন মাসেই কপির বীজ থেকে একজায়গায় কপির চারাগাছ তৈরি করতে হয়। ঐ জায়গাকে বীজতলা বলে। চারাগুলো তিন চার ইঞ্চি বড় হলে তৈরী জমিতে সার দিয়ে ফাঁক ফাঁক করে পুঁততে হয়। কপির জমিতে ভাল করে জল না দিলে কপি ভালভাবে জন্মায় না। কপি

তিন রকমের—ফুলকপি, বাঁধাকপি আর ওলকপি। বাঁধাকপি, ফুলকপির পরেও একমাস জমিতে বা খেতে থাকে।



বাঁধাকপি



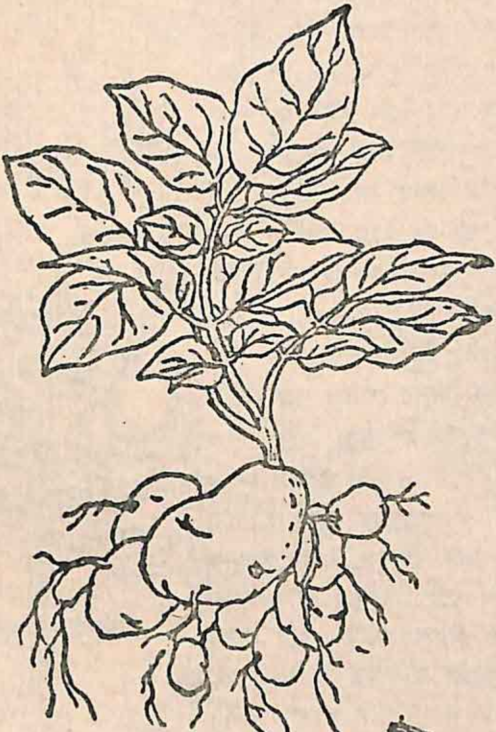
ফুলকপি



ওলকপি

গোলআলু—উঁচু, বেলে বা দোআঁশ মাটিতে আলু ভাল জন্মায়। খোল আর গোবরের সার আলুর খুব উপযোগী। আশ্বিন মাসে আলুর

গোটা বীজ বা বড় আলু বীজের অঙ্কুর সমেত টুকরো মাটিতে একসারে ফাঁক ফাঁক করে পুঁততে হয়। ভাল ফলনের জন্যে আলুর খেতে মাঝে

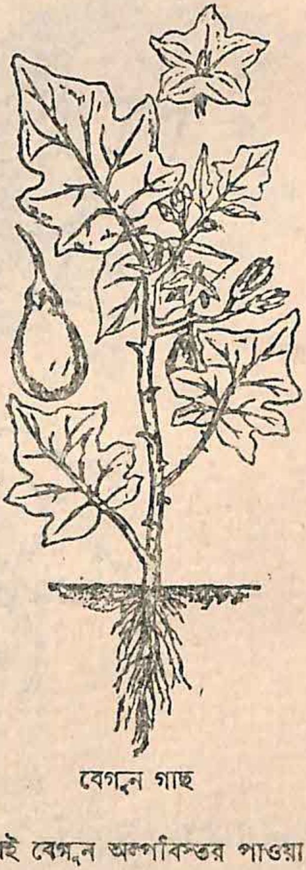


গোলআলু আর গাছ

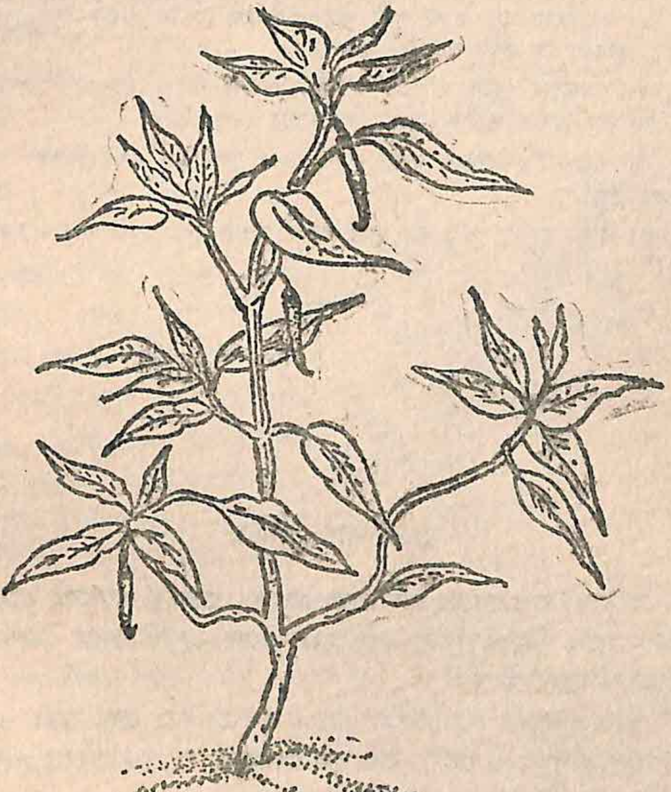
মাঝে জল দিতে হয়। এক একটা গাছ থেকে মাটির নিচে অনেক আলু জন্মায়। পৌষ-মাঘ মাসে আলু পুষ্ট হলে খেত থেকে তুলতে হয়।

মুলো—মুলোর জন্যে মাটি খুব ভাল করে চাষ করতে হয়। সাধারণত আশ্বিন-কার্তিক মাসে মুলোর বীজ লাগাতে হয়। পৌষ মাসের মধ্যে মুলো বড় হয়ে যায়।

বেগুন—আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বীজ-তলাতে বেগুনের বীজ পুঁততে হয়। এক সপ্তাহ পরে চারা বের হয়। চারা-গুলো যখন বাড়ে সেই সময়ের মধ্যে খেতের মাটি তৈরি করে নিতে হয়। চারাগুলো পাঁচ-ছয় ইঞ্চি আন্দাজ লম্বা হলে, তাদের তুলে, একসারে দুই কিংবা আড়াই হাত অন্তর জমিতে পুঁতে দিতে হয়। পোঁতার পর প্রথম দু-তিন দিন চারাগুলোকে দিনের বেলায় কলাগাছের খোলা বা কাগজের ঠোঙা দিয়ে ঢেকে দিতে হয়। দু-তিন দিন এরকম করায় পর রোদে চারাগুলোর আর কোনো ক্ষতি হয় না। বেগুন গাছে অনেক সময় পোকা ধরে; গাছের পাতাগুলো খেয়ে ফেলে জালের মতো করে দেয়। ঐ সময় ঘুঁটের ছাইয়ের সঙ্গে একটু কেরোসিন তেল মিশিয়ে পাতার ওপর দিলে পোকা মরে যায়। কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ আর মাঘ মাস পর্যন্ত গাছে প্রচুর বেগুন ধরে। বেগুনের ফলন শীতকালেই বেশী হয়, তবে বারমাসই বেগুন অল্পবিস্তর পাওয়া যায়।


বেগুন গাছ

লঙ্কা—লঙ্কা বারমাস ধরেই ফলে। সাধারণত বৈশাখ কিংবা ভাদ্র



লঙ্কা গাছ

মাসে বীজতলায় চারা তৈরি করে জমিতে লাগাতে হয়। শ্রাবণ থেকে মাঘ মাস পর্যন্ত লঙ্কা প্রচুর ফলে।

উত্তর লেখ

১। তোমাদের গ্রামে গ্রীষ্ম, বর্ষা আর শীতকালে কি কি শাক-সবজি পাওয়া যায়? এসবের চাষ কখন আরম্ভ করতে হয়?

২। তোমাদের স্কুলে, বাড়িতে বা বন্ধুবান্ধবদের বাগানে যেসব শাক-সবজি জন্মেছে তার অন্তত দুটোর কিভাবে চাষ করতে হয়েছে লেখ।

৩। শাক-সবজি জন্মাতে গেলে কোন্ কোন্ জিনিসের ওপর বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে?

৪। কোন্ কোন্ সবজি বার মাসই পাওয়া যায়? কিভাবে এদের চাষ করতে হয়?

২

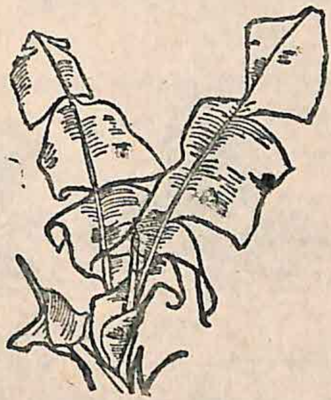
গাছপালার পরিচয়

মাঠেঘাটে কত রকমের গাছগাছড়া রয়েছে। তোমরা অনেকেই অনেক গাছ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জান না। এদের চেনার আগ্রহ নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে রয়েছে।

প্রধানত গাছের পাতা, ফুল আর ফল দেখে গাছ চেনা যায়। এক এক গাছের পাতা বা চেহারা এক এক রকমের। পাতা সাধারণত সবুজ রঙের হয়। কিন্তু রঙবেরঙের পাতাও আছে—যেমন পাতাবাহার গাছ। যেসব গাছে সুন্দর সুন্দর ফুল ফোটে, তাদের নিয়ে ফুলের বাগান করা হয়। ফুলের আকৃতি, রঙ ইত্যাদি দেখে কোন্‌টা কি ফুলের গাছ সহজেই বলা যায়। যেসব গাছ ফলের জন্যে জন্মানো হয়, যেমন আম, কাঁঠাল, আতা, পেঁপে ইত্যাদি, তাদের ফলের গাছ বলে। ফল দেখে

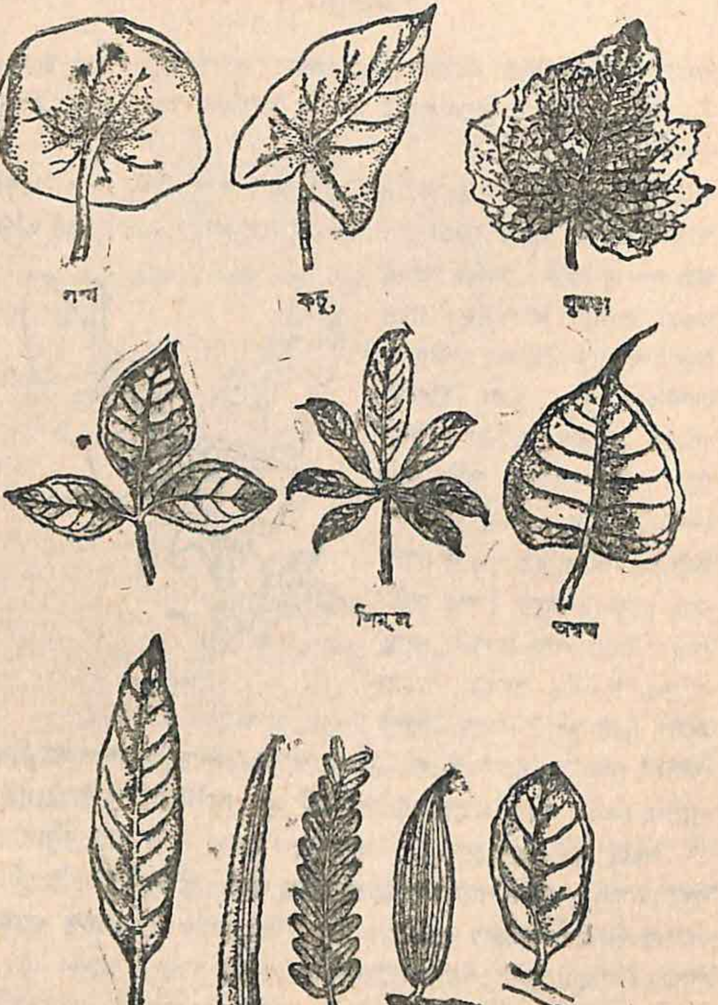
এসব গাছের পরিচয় সহজে পাওয়া যায়। পাতা, ফুল আর ফলের সাহায্যে গাছ চিনতে গেলে এদের সম্বন্ধে তোমাদের আরও কিছু জানা দরকার।

পাতা : একটা কলাপাতা নিয়ে এর নানা অংশ দেখ। এর চওড়া পাতলা অংশকে **ফলক** বলে। এই ফলক পেতে আমরা খাই। এর ডাঁটা হল পাতার **বোঁটা**। বোঁটার নিচের চওড়া অংশটা কলাগাছের গায়ে জড়ান থাকে। এর নাম **খোলা** বা **বেষ্টনী**। কচু, তাল ইত্যাদি গাছের পাতায় এইরকম তিন অংশ অর্থাৎ ফলক, বোঁটা আর বেষ্টনী আছে। আখ, আনারস, ভুট্টা ইত্যাদি গাছের পাতার ফলক আর বেষ্টনী আছে, কিন্তু বোঁটা নেই। জবা, পদ্ম, অশ্বত্থ, আম, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছের পাতায় ফলক আর বোঁটা আছে, কিন্তু বেষ্টনী নেই; বেশির ভাগ পাতাই এই ধরনের। রঙ্গন, গন্ধরাজ প্রভৃতির পাতায় কেবল ফলক আছে, বেষ্টনী নেই এবং বোঁটা নেই বললেই হয়।


কলাপাতা

পাতা নানা আকারের। পদ্মপাতা গোলমতো, আম আর বাঁশপাতা বল্লমের ফলার মতো, পানের পাতা হরতনের মতো। আম, কাঁঠাল ইত্যাদির পাতার কিনারা সমান। গোলাপ, জবা, নিম, আনারস প্রভৃতি গাছের পাতার কিনারা কাটা। দেবদারু পাতার কিনারা ঢেউ-খেলানো।

একটা পান বা আম পাতার সঙ্গে একটা বেল, শিমুল, বা তেঁতুল পাতার তুলনা কর। পান বা আমপাতার বোঁটার আগায় একটিমাত্র ফলক, কিন্তু বেলপাতার বোঁটার আগায় তিনটি, শিমুল পাতায় পাঁচটি বা



॥ পাতা ॥

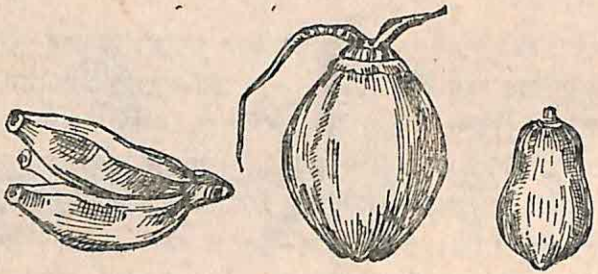
সাতটি আর তেঁতুল পাতায় অনেকগুলো ফলক রয়েছে। পান, আম ইত্যাদির পাতাকে একফলক পাতা আর বেল, শিমুল ও তেঁতুলের পাতাকে বহুফলক পাতা বলে। বহুফলক পাতার ফলকগুলোও দুরকমে সাজানো থাকে। বেল, শিমুল, শিম ইত্যাদি পাতার ফলকগুলো বোঁটার ওপরে হাতের আঙুলের মতো পাশাপাশি সাজানো; তেঁতুল, নিম, মটর ইত্যাদি পাতার ফলকগুলো পাখির পালকের রোঁয়ার মতো দুই দিকে সাজানো।

ফুল : নানা রঙের আর আকৃতির ফুল রয়েছে। ফুলের গঠন আর আকৃতি সম্বন্ধে পরে বলা হবে। সাদা রঙের ফুলের মধ্যে বেল, জুঁই, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, কিছু কিছু গোলাপ, ধুতরা প্রভৃতি আমরা সাধারণত দেখতে পাই। জবা, করবী, পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া লাল রঙের ফুল। গোলাপী রঙের ফুলের মধ্যে গোলাপ ফুলই প্রধান, স্থল-পদ্মও গোলাপী হয়। হলদে ফুল—কলকে, সরষে, ঝিঙে। সোনালী ফুল—চাঁপা, গাঁদা ইত্যাদি। নীল ফুল—অপরাজিতা।

ফল : ফুল থেকে ফল হয়। আম, জাম, পেঁপে, শসা, আঙুর, উচ্ছে, কলা, নারকেল ইত্যাদি ফলের সবগুলোই এক একটা ফুল থেকে হয়েছে। এইজন্যে এদের একক ফল বলে। আনারস, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের গঠন একেবারে অন্য। এসব গাছে ফুলের মঞ্জরী বা শিষ হয়। ঐ শিষের মাঝে একটা শির বা দণ্ড থাকে আর অনেক ফুল ঐ শিরে সাজানো থাকে। কাঁঠালের মুচি, যেটা বেড়ে ফল হয় সেটা কাঁঠালের ফুলের শিষ। এইভাবে অনেকগুলো ফুল থেকে একটা ফল হলে তাকে যৌগিক ফল বলে। পাকা কাঁঠাল ভাঙলে তার মাঝে যে মুগুরের মতো একটা জিনিস দেখা যায়, সেটাই হল শিষের শির বা দণ্ড। ঐ শিরে যেসব কাঁঠালের কোয় থাকে, তারা এক-একটা ফুল থেকে উৎপন্ন। এক-একটা কোষের মধ্যে এক-একটা বড় বীজ থাকে। কাঁঠালের মতো আনারসও ফুলের মঞ্জরী থেকে হয়। আনারসের গায়ে অনেক চৌ-কোনা

অংশ বা চোখ দেখতে পাওয়া যায়। এরা এক-একটা ফ্ল থেকে হয়েছে। বট আর ডুমুর ফল অনেকগ্লো ফ্ল থেকে হয়; এইজন্যে এদেরও বলা হয় **যৌগিক ফল**।

আমাদের দেশে বারমাসে নানারকম ফল হয়। রকম রকম ফলের চেহারা, গঠন যেমন আলাদা খেতেও তেমনি আলাদা। কোনটা বেশ মিষ্টি, কোনটা টক, কোনটা আবার টক-মিষ্টি মেশানো।

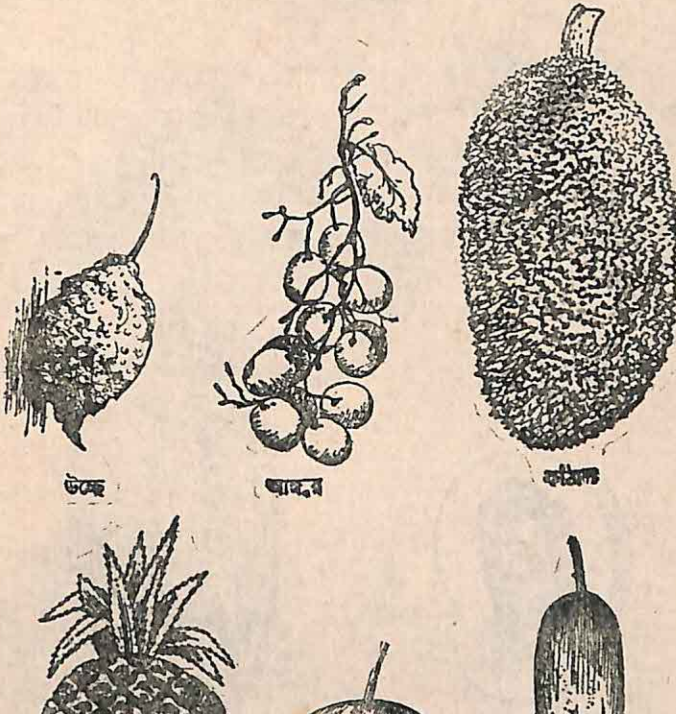


কলা নারিকেল পেঁপে

॥ **ফল** ॥

পাকা আম খাবার সময় আমরা বাইরের খোসটা ছাড়িয়ে শাঁসটা খাই আর ভেতরের আঁটিটা ফেলে দিই। আম, জাম, কাঁঠাল, শসা, পেঁপে ইত্যাদি ফলের শাঁস রসাল। এইজন্যে এসব ফলকে **রসাল ফল** বলে। শিম, মটরশ্ঁটি, স্পারি, বরবটি, বাদাম, পেস্তা ইত্যাদি **নীরস ফল**। কোন কোন নীরস ফলের, যেমন দোপাটি, বরবটি বা মটরশ্ঁটি ইত্যাদির বীজ একটা লম্বা খোলার মধ্যে থাকে; ফল পাকলে খোলা ফেটে যায় আর বীজগ্লো বেশ কিছ্ দূর ছড়িয়ে পড়ে। সরস ফল পাকলেও বীজ আপনা থেকে ঝরে পড়ে না।

কয়েকটা সাধারণ গাছ চেনা : ফ্লগাছ আর ফলের গাছ চেনার ব্যাপারে ফ্ল আর ফলের জ্ঞান সাহায্য করে। এসব গাছ ছাড়া আমাদের



॥ ফল ॥

দেশে অনেক সাধারণ বড় বড় গাছ আছে, যাদের ফুল, ফল সহজেই নজরে পড়ে না, অথচ ঐসব গাছ তাদের চেহারা, ডালপালা কিভাবে থাকে, পাতা কিভাবে আছে এসব দিয়ে খুব সহজেই তাদের চিনিয়ে দেয়। নিচের বারটা গাছের নাম দেওয়া গেল, যে কটা চিনতে পারবে তাদের ছবি এঁকে এদের সম্বন্ধে যা জান লেখ : আম, কাঁঠাল, বট,



আম

লম্বালম্বি চেরা আম



কাঁঠাল

কাঁঠালের কোষ

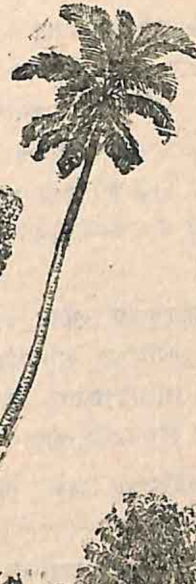
অশ্বত্থ, শিরীস, তেঁতুল, শাল, দেবদারু, বেল, কুল, নারকেল আর পাইন।

আম আর কাঁঠালগাছ—অনেকেই এই দুইটি গাছ দেখেছ। গ্রীষ্মের দিনে এদের ছায়ায় বেশ আরাম লাগে।

বটগাছ—পাখিরা বটের বীজ এনে ফেলে অন্য গাছ বা পাকা বাড়ির ওপর। সেখানেও বটগাছ গজায়। যত দিন যায় বট নিজের শেকড়



বট,



নারিকেল



শিরীষ



পাইন

গাছ

মাটিতে ঢুকিয়ে চারদিকে শাখা-প্রশাখা বাড়িয়ে বড় হতে থাকে। গোড়ার খানিকটা ওপরে, ডালগুলো মাটির সমান্তরাল হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব ডাল থেকে বটের ঝুরি (মূল) নেমে আসে। বারমাস শাখা-প্রশাখা ঘন পাতায় ঢাকা থাকে বলে এই গাছে অনেক পাখি বাস করে। নিচে জীবজন্তুও যথেষ্ট ছায়া পায়। দূর থেকে বটগাছকে একটা প্রকাণ্ড ছাতার মতো দেখায়। বটের পাতা অনেকটা বড় কাঁঠাল পাতার মতো।

অশ্বত্থগাছ—এদের জীবন শুরু হয় বটগাছের মতো। অশ্বত্থের প্রধান ডালগুলো খানিকটা ওপর থেকে সামান্য কোনাকুনি ভাবে ওপরে ওঠে। পাতা পাতলা হয়, পাতার ডগা লম্বা আর সরু। সেইজন্যে সামান্য হাওয়াতেই গাছের পাতাগুলো নড়তে থাকে।

শিরীষগাছ (রেইন্ ট্রি)—রাস্তার ধারে ছায়ার জন্যে এই গাছ পোঁতা হয়। এরা বেশ তাড়াতাড়ি বড় হয়ে ওঠে। ডালগুলো অশ্বত্থের চেয়ে আরও খাড়াভাবে চারদিকে ছড়িয়ে ওপরে ওঠে। এর পাতা বহুফলক, গরমের দিনে অনেক পাতা পড়ে যায়; তখন এর লম্বা লম্বা গুটি গাছে ঝুলছে দেখা যায়।

তেঁতুলগাছ—এই গাছ খুব বড় হতে দেখা যায়। তখন এর গোড়ার বেড়ও খুব মোটা হয়। এর পাতা বহুফলক আর ফলকগুলো আকারে ছোট।

শালগাছ—বনে এই গাছগুলো থামের মতো সোজা দাঁড়িয়ে থাকে। ডালপালা বেশ ওপর থেকে বের হয়। পাতাগুলো বড় বড়।

দেবদারুগাছ—বেশ লম্বা, গাছের নিচের দিকে ডালপালা নেই; তারপর ডাল আর লম্বা পাতা। পাতার কিনারা ঢেউ-খেলানো। কোন অনুষ্ঠানের সময় এই পাতা দিয়ে বাড়িঘর সাজানো হয়।

বেলগাছ—আকারে মাঝারি থেকে বড়। বোঁটার ডগাতে পাতার

তিনটে ফলক থাকে। ডালে বড় বড় কাঁটা আছে। প্রায় বারমাসই গাছে কাঁচ বা পুষ্ট বেল দেখা যায়।

কুলগাছ—ছোট থেকে মাঝারি আকারের গাছ। পাতাগুলো গোল মতো। ডালে কাঁটা আছে। ফল তোমরা সকলেই জান।

নারকেলগাছ—বেশ উঁচু গাছ। নারকেল, তাল, সুপারি, খেজুর, পাম ইত্যাদি গাছের কাণ্ড, মাথায় এক বোঝা লম্বা লম্বা পাতা নিয়ে কেবল ওপরের দিকে বাড়ে। এদের ডাল হয় না।

পাইনগাছ—এই গাছ দার্জিলিংয়ের মতো শীতের জায়গায় দেখা যায়। গাছের বেশ কতকটা ওপর থেকে ডালপালা বের হয়; আর তাতে থাকে লম্বা লম্বা সুচের মতো পাতা। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন মন্দিরের মতো, ওপরের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে।

উত্তর লেখ

১। কত রকম চেহারার পাতা দেখেছ? যে যে পাতা তোমার দেখতে ভাল লাগে তাদের আঁকো আর রঙ কর।

২। এক-ফলক আর বহু-ফলক পাতা কাকে বলে? প্রত্যেক শ্রেণীর তিনটে পাতার ছবি আঁকো।

৩। তুমি কি কি রঙের ফুল দেখেছ? এক এক রঙের ফুলের যতগুলো পার নাম কর।

৪। কি কি রকমের ফল দেখা যায়? প্রত্যেক ফলের অন্তত একটা করে উদাহরণ দাও।

৫। তোমাদের পাড়ার অন্তত পাঁচটা গাছ দেখে তাদের সাধারণ চেহারা আর পাতা কি রকম ছবি এঁকে দেখাও।

৩

প্রাণীর কথা

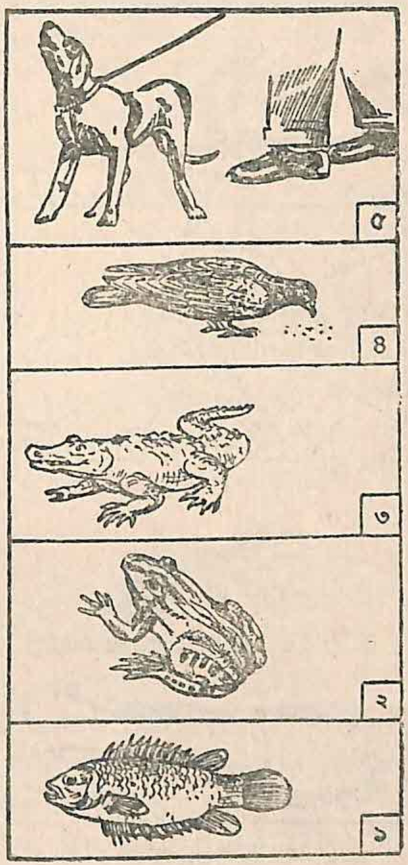
যদি প্রশ্ন করা হয় যে তোমাদের বাড়িতে কি কি প্রাণী আছে তবে তুমি নিশ্চয় পোষা গরু, ছাগল, কুকুর, বেড়াল, পাখি ইত্যাদির কথা বলবে। এসব যদি কিছুই না থাকে তবে হয়তো বলবে যে তোমাদের বাড়িতে কোন প্রাণীই নেই। কিন্তু তোমাদের মাস্টারমশাই কি এই উত্তরে খুশী হবেন? তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, তোমাদের ঘরে কি পিঁপড়ে, মশা, মাছি, মাকড়সা, টিকটিকি, ইঁদুর, আরশোলা প্রভৃতি কিছুই নেই? ভাল করে ভেবে দেখ, এরাও তো প্রাণী। এসব ছাড়া ঘরের মেঝেতে, আসবাবপত্রের ওপর, ধুলোর সঙ্গে এমন কি হাওয়াতেও অসংখ্য ছোট ছোট প্রাণী রয়েছে। এই প্রাণীগুলো এত ছোট যে খালি চোখে এদের দেখা যায় না; অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র (যা দিয়ে খুব ছোট ছোট জিনিস খুব বড় দেখায়) দিয়ে এদের দেখতে পাওয়া যায়। চেহারায় ছোট হলে কি হয় এদের ক্ষমতা মোটেই কম নয়। নানারকম রোগের বীজ ছড়িয়ে এরা মানুষের অনিষ্ট ঘটায়।

যেসব প্রাণী আমরা চোখে দেখতে পাই তাদের কয়েকটার বিবরণ এখানে দেওয়া হচ্ছে। এই প্রাণীদের মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ করা যায়—মেরুদণ্ডী প্রাণী আর অমেরুদণ্ডী প্রাণী।

মেরুদণ্ডী প্রাণী: এইসব প্রাণীদের শরীরের হাড়ের শক্ত কাঠামো থাকে। এই কাঠামোর প্রধান অবলম্বন মেরুদণ্ড বা পিঠের হাড়ের সার বা শ্রেণী। এইজন্যেই এরা মেরুদণ্ডী নামে পরিচিত। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের সকলের নিচের দিকে বা স্তরে রয়েছে জলে চরে বেড়ায় বা জলচর প্রাণী—যেমন মাছ। তার ওপরের স্তরে আছে, জলে আর ডাঙ্গায়

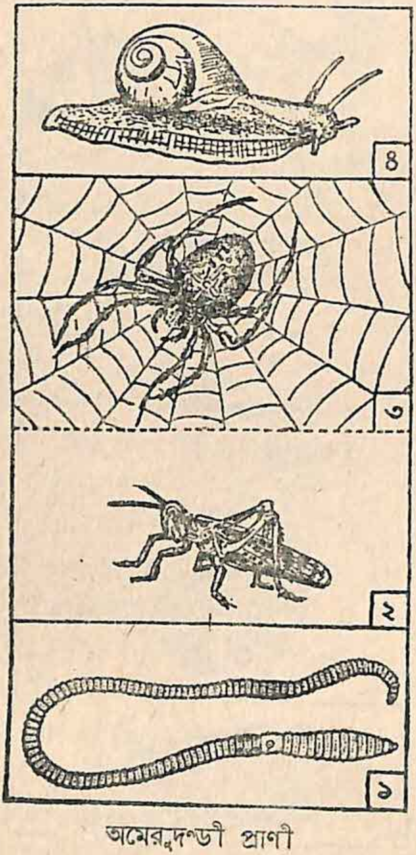
চরে বেড়ায় বা উভচর প্রাণী, ব্যাঙ। কুমির, কচ্ছপ, টিকটিকি, সাপ ইত্যাদি সরীসৃপেরা আরও উঁচু থাকের। এদের শরীর শক্ত আঁশ কিংবা হাড়ের মজবুত কাঠামোয় ঢাকা। এরা সাধারণত স্থলে বা ডাঙগায় থাকে, তবে এদের অনেকে জলেও থাকতে পারে। এদের চেয়েও ওপরের স্তরের জীব হল পাখি। এদের শরীর পালকে ঢাকা। পালক দেওয়া ডানা দিয়ে এরা উড়তে পারে। সকলের ওপরের স্তরে রয়েছে প্রাণীরা যারা স্তন্যপায়ী বা মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়। গরু, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, সিংহ, তিমি, বেড়াল, কুকুর, বাঁদর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি, মানুষ ইত্যাদি স্তন্যপায়ী প্রাণী।

স্তন্যপায়ী প্রাণীরা ডিম পাড়ে না; এদের একবারেই বাচ্চা হয়, আর মায়ের দুধ খেয়ে বড় হয়।



মেরুদণ্ডী প্রাণী
১। কই মাছ ২। ব্যাঙ ৩। কুমির
৪। পায়রা ৫। মানুষ ও কুকুর

এইজন্যেই এদের স্তন্যপায়ী বলা হয়। এদের দেহের ওপর লোম থাকে। এই সব প্রাণীদের একেবারে ওপরে মানুষের স্থান।



অমেরুদণ্ডী প্রাণী

১। কেঁচো ২। পতঙ্গ

৩। মাকড়সা ৪। শামুক

অমেরুদণ্ডী প্রাণী : এদের শরীরে হাড় বা মেরুদণ্ড নেই। এইজন্যে এদের অমেরুদণ্ডী বলা হয়। এদের মধ্যে **কেঁচো,** নানারকম **কীটপতঙ্গ, চিংড়ি, কাঁকড়া, মাকড়সা, শামুক** ইত্যাদি পড়ে। কেঁচো খুব নিচু স্তরের প্রাণী। কেঁচোর ওপরে কীটপতঙ্গ আর মাকড়সা। শামুক অমেরুদণ্ডীদের সকলের ওপরে।

অমেরুদণ্ডী আর মেরুদণ্ডী প্রাণীদের কয়েকটার সম্বন্ধে এখানে বলা হচ্ছে। নিচু থাকের বা স্তরের অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিয়ে আরম্ভ করা যাক।

কয়েকটা অমেরুদণ্ডী প্রাণী : কেঁচো—এর দেহ প্রায় সাত-আট ইঞ্চি লম্বা, সরু দড়ির মতো গোল। সমস্ত শরীরে আংটির মতো অংশ-

গুলো পর পর সাজানো—এদের গুনে দেখতে পারলে দেখবে ১০০ থেকে ১২০টা এইরকম আংটি আছে। দেহের সামনের দিকে একটা ছ্যাঁদা বা ছোট গর্ত এদের মুখ; আর শরীরের পেছনের দিকে মলদ্বার বা পায়খানা করার জায়গা। কেঁচো মাটিতে গর্ত করে থাকে। দিনের আলো বিশেষ সহ্য করতে পারে না। এইজন্যে রাত্রে খাবারের খোঁজে বের হয়। গাছের কচি পাতা বা মাটি কিংবা মাটির সঙ্গে মেশানো খাবার খেয়ে থাকে। নিচের স্তরের প্রাণীদের মধ্যে এদের শরীরেই প্রথম রক্ত দেখা যায়। গায়ের পাতলা চামড়ার ভেতর দিয়ে এদের নিশ্বাস-প্রশ্বাস চলে।

মাঠে, পথের ধারে কুণ্ডলী পাকানো ছোট ছোট অনেক কেঁচোর ঢিপি দেখা যায়—এগুলো কেঁচোর মল। কেঁচোরা মাটিতে সুড়ঙ্গ কাটে; ফলে মাটি আলগা হয় আর গাছের খুব দরকারী জল আর হাওয়া ঐ পথে মাটিতে ঢোকে। তাছাড়া নিচের মাটি ওপরে আসে বলে জমির উর্বরতা বাড়ে। এইভাবে জমি উর্বর করছে বলে এরা চাষীদের বিশেষ বন্ধু।

কীট-পতঙ্গ—এদের দেহে তিনটে বিভিন্ন অংশ—যেমন মাথা, বুক আর পেট। বুকের নিচে তিনজোড়া পা। অনেকগুলো টুকরো টুকরো অংশ নিয়ে এক একটা পা। এইজন্যে এদের **সন্ধিপদ** বলে। মানুষের দেহ লক্ষ্য করে দেখবে দুটো অংশ নিয়ে পুরো পা—হাঁটুর কাছে সন্ধি বা জোড়। কীটপতঙ্গের মাথার দুপাশে দুটো চোখ; এক একটা চোখ আবার অনেকগুলো ছোট ছোট চোখ নিয়ে গড়ে উঠেছে; ফলে এরা সবদিকেই দেখতে পায়। মাথার দুধারে দুটো করে সরু শুঁড় আছে। বেশির ভাগ পতঙ্গের পিঠের ওপর পাখা বা ডানা আছে। **ফড়িং, প্রজাপতি, মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়ে** প্রভৃতির দুজোড়া ডানা, আর **মশা, মাছি** ইত্যাদির একজোড়া করে ডানা আছে। ছারপোকা, উকুন প্রভৃতিদের ডানা নেই। বেশির ভাগ পতঙ্গের জন্মাবার পর থেকে ভাল-

ভাবে বেড়ে ওঠা পর্যন্ত, দেহের নানারকম অদলবদল হয়। প্রজাপতি আর মথের জীবনের নানারকম অবস্থার কথা আগেই বলা হয়েছে।

কতকগুলো কীট-পতঙ্গ আমাদের উপকার করে, আবার অনেক-গুলো খুবই অনিষ্ট করে। যারা অনিষ্ট করে সেইরকম প্রাণীদের সংখ্যাই সব থেকে বেশী। সমস্ত প্রাণীদের মোট পাঁচ ভাগ করলে দেখা যায় এই পাঁচ ভাগের চার ভাগই পতঙ্গজাতীয় আর বাকী এক ভাগ অন্য সব প্রাণী।

মাকড়সা—দেখতে অনেকটা পতঙ্গের মতো হলেও এরা আসলে পতঙ্গ নয়; নানা বিষয়ে এদের তফাত দেখা যায়। এদের পা চারজোড়া, পতঙ্গের তিনজোড়া। এদের শরীর দুভাগে ভাগ করা যায়, যেমন মাথা আর পেট। বুক মাথার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। মাথার ওপরে চারজোড়া চোখ; কোন কোন জাতের তিনজোড়াও দেখা যায়। পতঙ্গের মতো এদের শুঁড় নেই। মুখের দুধারে দুটো করে বড় দাড়া আছে। মুখের কাছে আরো দুটো ছোট দাড়া আছে; এদের সাহায্যে মাকড়সা যেসব পোকামাকড় ধরে তাদের গায়ে বিষ ঢেলে দেয়।

মাকড়সার পেটের নিচের একটা বিশেষ অংশ থেকে রস বের হয়ে ঘন হলে মাকড়সা তা দিয়ে খুব সরু সুতো কেটে খুব চমৎকার জাল বুনতে পারে। জাল বুনে মাকড়সা শিকার ধরবার জন্যে জালের একপাশে লুকিয়ে থাকে। মশা, মাছি বা অন্য পোকা ঐ জালে পড়লেই জালে টান পড়ে; তখন মাকড়সা তাকে আক্রমণ করে মেরে তার গায়ের রস শুষে খেয়ে ফেলে। স্ত্রী-মাকড়সা একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। ডিম পাড়বার আগে শরীর থেকে সুতো বার করে একটা থলি তৈরি করে, আর ডিম পেড়ে ঐ থলির মধ্যে রাখে। স্ত্রী-মাকড়সা ঐ থলি নিয়ে বেড়ায়। কোন কোন মাকড়সা জালে থলি ঝুলিয়ে রাখে। ডিম থেকে যে বাচ্চা হয় তারা দেখতে সাধারণ মাকড়সার মতোই, শুধু আকারে ছোট।

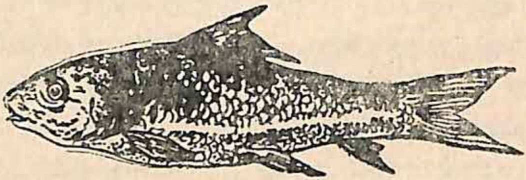
শামুক—বর্ষাকালে খেত-খামারে, পুকুর, খাল, বিল বা ডোবার ধারে ছোটবড় নানারকমের শামুক দেখা যায়। জলের শামুকই বেশী, তবে কয়েকরকম শামুক ডাঙগাতেও থাকে। স্থলচর শামুক এক অদ্ভুত ধরনের প্রাণী। হাত, পা কিছুই নেই, কোন্‌টা মাথা, কোন্‌টাই বা বুক বা পেট তা চেনা দায়। আসল প্রাণীরই খোঁজ পাওয়া যায় না। ওপর থেকে যা দেখা যায় সেটা শামুকের আসল শরীর নয়; দেহের ওপরে শাঁখের মতো পাকান শক্ত একটা খোলা বা ঢাকা মাত্র। ঐ শক্ত খোলার মধ্যে থাকে শামুকের নরম দেহ। ঐ খোলাটাই শামুকের বাসা—শামুকের দেহ থেকে একরকম জিনিস বেরিয়ে ঐ রকম শক্ত খোলা হয়ে যায়। ভয় পেলে শামুক সমস্ত দেহ খোলার মধ্যে ঢুকিয়ে নেয়। শামুকের শরীরে কোনো হাড় নেই।

শামুকের দেহের পুরু মাংসল যে অংশ সেটা তার পায়ের কাজ করে। শামুক চলতে থাকলে সেটা দেখা যায়। চলার আগে শামুক তার মাথাটা বার করে। এদের মাথায় দুজোড়া শুঁড়। লম্বা শুঁড়ের সাহায্যে শামুক চলার পথের অবস্থা জেনে নেয়। এ শুঁড়ের ওপর একজোড়া চোখও আছে। শামুকের মাথার নিচের দিকে মুখ আর তাতে ধারাল দাঁত আছে। গাছের কচি পাতা খেয়ে এরা বাগানের গাছপালার খুবই ক্ষতি করে। শামুক সাধারণত রাত্রিবেলা বের হয়। শীতকালে এরা মাটির নিচে ঘুমোয়। বর্ষায় ছোট ছোট ডিম পাড়ে। এদের ডিম ফুটে বাচ্চা হয়।

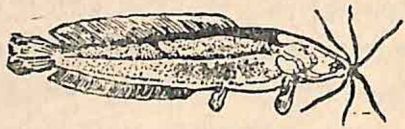
জলের শামুক অনেকটা গোল ধরনের। এদের মাংসল পায়ের নিচে ঢাকনি থাকে শক্ত খোলার। ভয় পেলে বা নাড়া দিলে এই মাংসল অংশ খোলার মধ্যে ঢুকিয়ে এরা কপাট বন্ধ করে দেয়।

কয়েকটা মেরুদণ্ডী প্রাণী : মাছ—মাছ কাটবার সময় বা খাওয়ার সময় মাছের কাঁটা বা হাড় আর তার শিরদাঁড়া হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে। মাছের হাড়কে আমরা কাঁটা বলি। রুই মাছের ছবি দেখ। এর

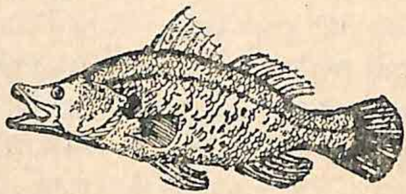
কানকো আর পেটের দুপাশে একজোড়া করে পাখনা আছে। এছাড়া পিঠের ওপর আর পেটের পেছনে একটা করে পাখনা আছে। সকলের বড় পাখনা রয়েছে লেজে। এসবের সাহায্যে মাছ জল কেটে চলাফেরা



রুই



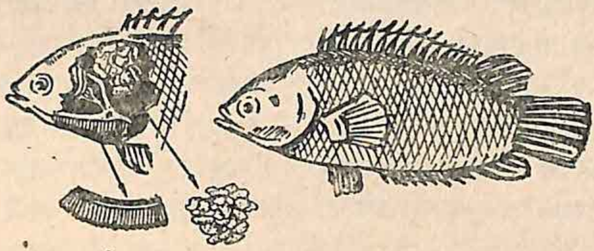
মাগুর



ভেটকি

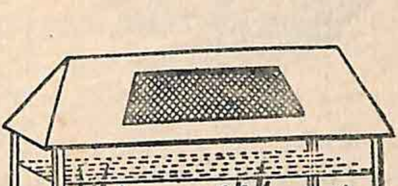
করতে পারে। নানারকম মাছের পাখনা নানারকমের। কানকোর নিচে যে ফুলকো থাকে তা দিয়ে মাছ জলের সঙ্গে মেশানো হাওয়া নেয়। মাছ মুখে জল নিয়ে মুখ বন্ধ করে আর জলের ওপর চাপ দেয়। এর ফলে জল ফুলকোর মধ্যে চলে যায়; ফুলকোতে জালের মতো রক্তের

অনেক নালী আছে। জলে মেশান হাওয়ার দরকারী ভাগ ফুলকোর রক্তের সঙ্গে মিশে গিয়ে সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে।



কই মাছ
১। ফুলকো ২। অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র

কোন কোন মাছের নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ধরন আরও উন্নত—যেমন কই, মাগুর আর সিঙ্গি মাছের। এসব মাছ ফুলকোর সাহায্যে জলের মধ্যে নিশ্বাস-প্রশ্বাস চালায়। ডাঙ্গায় তুলে আনলেও এরা অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে। এর জন্যে এদের ফুলকোর ওপর দিকে এদের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র রয়েছে। এটা স্পঞ্জের মতো নরম। এই স্পঞ্জের মতো জিনিসের সাহায্যে কই মাছ ডাঙ্গাতে আমাদের মতো এমনি হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারে। জলের মধ্যে একমাত্র ফুলকোর সাহায্যে শ্বাস নিয়ে কই মাছ বাঁচতে পারে না। কোনো কাঁচের বাক্সে



জলাধার

বা জলাধারের মধ্যে কই মাছ রেখে দিলে তাকে মাঝে মাঝে জলের ওপর মুখ বার করে জলের বাইরের হাওয়া নিতে হয়।

উভচর—এই ধরনের প্রাণীর মধ্যে ব্যাঙ সকলেই দেখেছ। এদের জীবনের প্রথম অবস্থা জলে কাটে। পরে বড় হলে এরা ডাঙগায় থাকে। এইজন্যেই এদের উভচর বলা হয়। ব্যাঙের জন্মের কথা আগেই বলা হয়েছে। বর্ষাকালে স্ত্রী-ব্যাঙ জলে ডিম পাড়ে। কয়েকদিন পরে ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়। এদের বলা হয় ব্যাঙাচি। এইসময় এদের মাথা আর লেজ থাকে। এই অবস্থায় এদের মাথার দুপাশে ছোট ছোট



কুনো ব্যাঙ



সোনা ব্যাঙ

ফুল্‌কো দেখা যায় আর মাছের মতো ফুল্‌কোর সাহায্যে জলের মধ্যেই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায়। কয়েকদিন বাদে বাইরের ফুল্‌কোর বদলে ভেতরের ফুল্‌কো দেখা দেয়। ব্যাঙাচি লেজের সাহায্য নিয়ে সাঁতার দিয়ে বেড়ায় আর ফুল্‌কো দিয়ে শ্বাসকার্য চালায়। তখন এরা শেওলা আর জলের অন্য ছোট ছোট প্রাণীদের খায়। এর পরে এদের শরীরের মধ্যে ফুসফুস দেখা দেয়। তখন থেকে ফুসফুসের সাহায্যে বাইরের হাওয়া নিতে পারে। আস্তে আস্তে এদের পেছনের আর সামনের পা দেখা দেয়। ফুসফুস যখন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করবার

মতো উপযুক্ত হয় তখন ব্যাঙ জল ছেড়ে ডাঙ্গায় উঠে আসে। ব্যাঙের লেজ ক্রমে দেহের সঙ্গে মিলিয়ে যায়। এর পরের অবস্থা হল পূর্ণ আকারের ব্যাঙ। এরা তখন পোকামাকড় ধরে খায়। ব্যাঙের দেহে শির-দাঁড়া আছে। পেছনের পা বড়। এজন্যে এরা লাফিয়ে দূরে যেতে পারে। পেছনের পায়ের আঙ্গুলগুলো হাঁসের আঙ্গুলের মতো জোড়া বলে এরা সহজেই জলে সাঁতার দিতে পারে।

সাধারণত আমাদের দেশে দুজাতের ব্যাঙ দেখা যায়। একটাকে বলা হয় সোনা ব্যাঙ বা কোলা ব্যাঙ, আর একটাকে বলে কুনো ব্যাঙ। সোনা ব্যাঙ সাধারণত জলে থাকে, সময় সময় পুকুর, ডোবা ইত্যাদির কাছে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সোনা ব্যাঙ খুব বড় বড় হয়। পেটের রং হলদে, কাঁচা সোনার মতো—এইজন্যেই নাম সোনা ব্যাঙ। পিঠে সবুজের ওপর কাল ডোরা। কুনো ব্যাঙ ডাঙ্গায় ঘুরে বেড়ায়। এদের চামড়া খস্‌খসে। সমস্ত শরীরে আঁচিলের মতো ছোট ছোট গুটি দেখা যায়। এদের তুলনায় সোনা ব্যাঙ দেখতে সুন্দর।

ব্যাঙের শরীরে দুটো ভাগ আছে—মাথা আর দেহকাণ্ড। এদের ঘাড় নেই। আমাদের জিব মুখের ভেতর পেছন দিকে আঁটা। ব্যাঙের জিব নিচের চোয়ালের সামনের দিকে আঁটা আর ভেতরে গোটানো। জিবটা আবার আঠাল। এইজন্যে লম্বা আঠাল জিবটা বার করে বেশ দূর থেকে পোকামাকড় ধরে আনতে পারে। তারপর শিকার মুখ দিয়ে গিলে ফেলে।

চাষের জমিতে যে সব পোকামাকড় ফল ফসল খেয়ে নষ্ট করে ব্যাঙ তাদের খেয়ে ফেলে আমাদের সকলের উপকার করে।

সরীসৃপ—টিকটিকি, সাপ, কচ্ছপ, কুমির ইত্যাদি এই শ্রেণীর জীব। এরা ছোট ছোট পায়ে বা শরীরের ওপর ভর দিয়ে চলে। এদের শরীর শক্ত কিংবা হাড়ের মজবুত কাঠামোয় ঢাকা। টিকটিকি ডাঙ্গার জীব। বেশির ভাগ সাপ ডাঙ্গায় থাকে, তবে জলচর সাপও আছে। কচ্ছপ আর

কুমির জল আর ডাঙ্গা দুজায়গাতেই থাকে। এরা গরম পছন্দ করে, এইজন্যে গরমের দেশেই এদের বেশী দেখা যায়।

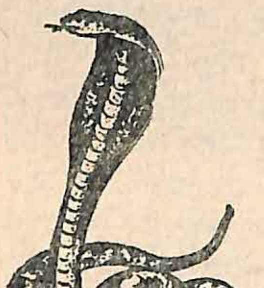


টিকটিকি



কচ্ছপ

সরীসৃপের মধ্যে সাপ এক অদ্ভুত জীব। চেহারায় লম্বা দড়ির মতো। পা নেই কিন্তু জলে অনেক সাপ ভাল সাঁতার কাটতে পারে, গাছে



সাপ—ফণাধর



সাপ—ফণাহীন

চড়তে পারে আবার ডাঙ্গায় চলতেও পারে। সব সরীসৃপেরই ডিম থেকে বাচ্চা হয়। কোন কোন সাপের ডিম সাপের পেটের ভেতর থাকতে

থাকতেই ফুটে যায়। এর ফলে এদের ডিম না বের হয়ে একেবারে বাচ্চা বের হয়।

আমাদের দেশে নানারকমের সাপ আছে। তাদের মধ্যে কতকগুলোর বিষ নেই, আবার কিছু সাপের বিষ আছে। গোখ্রো, শংখচূড়, কেউটে, চন্দ্রবোড়া ইত্যাদি খুবই বিষধর সাপ। এদের কামড়ে মানুষ আর জীব-জন্তু প্রায়ই মারা যায়। ঢোঁড়া, হেলে, লাউডগা ইত্যাদি সাপের বিষ নেই। বিষধর সাপের ওপরের চোয়ালের দুদিকে দুটো বিষের থলি আর সাধারণ দাঁত ছাড়া দুটো বড় দাঁত আছে। এই দাঁত দুটোর ভেতর ফাঁপা। এই দুটো বিষদাঁত। সাপ কামড়ে বিষদাঁত বসিয়ে দিলে ঐ থলি থেকে বিষ ঐ বিষদাঁতের ফাঁপা নল দিয়ে এসে কামড়ের জায়গায় রক্তের সংগে মিশে যায়। ফলে রক্ত নষ্ট হয়ে যাদের সাপে কামড়েছে তারা মারা যায়।

বিষধর সাপ মানুষের যত ক্ষতি করে, সব রকমের সাপেরা মিলে কিন্তু তার থেকে উপকার করে অনেক বেশী। যেসব প্রাণী শস্য নষ্ট করে, যেমন ইঁদুর, কাঠবেড়াল, খরগোশ, তারা সব সাপের খাদ্য।

পাখি আর স্তন্যপায়ী শ্রেণীর কিছু প্রাণীর কথা পরে বলা হবে।

উত্তর লেখ

১। মেরুদন্ডী আর অমেরুদণ্ডী প্রাণী কাদের বলে? এই দুরকম প্রাণীর কতকগুলো করে নাম লেখ।

২। মেরুদন্ডী প্রাণীদের মধ্যে নিচের থেকে ওপরের স্তরের যে যে প্রাণী আছে তাদের দৃষ্টান্ত দাও।

৩। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে কতরকমের প্রাণী দেখা যায় তাদের নাম লেখ।

৪। নিচের স্তর থেকে আরম্ভ করে ওপরের স্তর পর্যন্ত কয়েকটা অমেরুদণ্ডী প্রাণীর নাম লেখ। এদের মধ্যে কোন্ স্তরের প্রাণীর সংখ্যা সব থেকে বেশী?

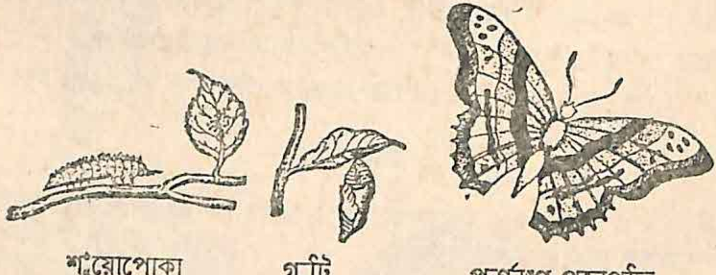
৫। মাছ কিভাবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চালায় লেখ। কই মাছ কেন জলের বাইরে অনেকক্ষণ বেঁচে থাকে?

৪

কীট-পতঙ্গ

কীট-পতঙ্গের কথা আগেই বলা হয়েছে। বাড়ি, ঘর, বাগান বা বাড়ির আশেপাশে দেখতে পাওয়া যায় এমন কয়েকটা পতঙ্গের কথা এখন বলা হবে।

প্রজাপতি—নানা আকারের আর নানা রঙের প্রজাপতি তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। সমস্ত কীট-পতঙ্গদের মধ্যে প্রজাপতিই দেখতে সব-থেকে সুন্দর। প্রজাপতির শরীরে তিনটি ভাগ—মাথা, বুক আর পেট। তিন জোড়া পা বুক থেকে বের হয়েছে। পিঠে দু জোড়া ডানা, মাথায় দুটো চোখ আর দুটো শুঁড় আছে। মুখে একটা সরু গোটানো নল



শুঁয়োপোকা গুটি পূর্ণাঙ্গ প্রজাপতি

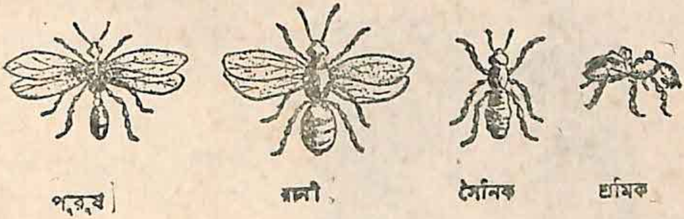
আছে। প্রজাপতি যখন ফুলের ওপর মধু খেতে বসে তখন পাক খুলে নলটা সোজা হয়ে যায় আর প্রজাপতি ফুলের মধ্যে ঐ নলটা ঢুকিয়ে মধু শুষে নেয়।

প্রজাপতির জন্ম অদ্ভুত। স্ত্রী-প্রজাপতি গাছের পাতায় একসঙ্গে অনেক ডিম পাড়ে। কিছুদিন পরে ডিম থেকে শুঁয়োপোকা বেরিয়ে

আসে। গায়ে শুঁয়ো থাকে বলেই এদের শুঁয়োপোকা বলা হয়। এরা গাছের কচিপাতা খেয়ে বড় হতে থাকে। কিছুদিন পরে একরকম গুটি তৈরি করে তার ভেতর বাস করতে থাকে। পরে এই গুটি বা খোলস কেটে প্রজাপতি বের হয়।

মথ—মথ প্রজাপতির মতো আর একরকমের পতঙ্গ। এরা সাধারণত রাত্রে বের হয়। প্রজাপতির মতো এত সুন্দর মথেরা দেখতে নয়। প্রজাপতি আর মথ চেনবার সহজ উপায় হল এরা কি ভাবে ফুলের ওপর বসে সেটা লক্ষ্য করা। প্রজাপতি পাখা গুটিয়ে, ওপরের দিকে তুলে ফুলের ওপর বসে; আর মথ বসে পাখা ছড়িয়ে। একরকমের মথের গুটি থেকে রেশম পাওয়া যায়।

সামাজিক কীট-পতঙ্গ—মানুষ যেমন এক সমাজে, সকলে সকলকার সঙ্গে মিলে মিশে বাস করে, পিঁপড়ে, উই, মৌমাছি, বোলতা এরাও ঐরকম নিজেদের মধ্যে একটা সমাজ গড়ে তুলে বাস করে।

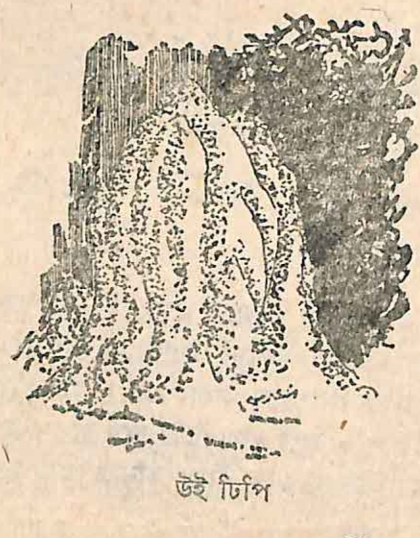


॥ পিঁপড়ে ॥

পিঁপড়ে—বাড়ির আনাচে-কানাচে বা যেখানে একটু মিষ্টি পড়ে আছে বা যেখানে পোকা-মাকড় মরেছে, সেখানেই পিঁপড়ের দল দেখা যায়। মাঠে, ঘাটে, গাছের ডালেও পিঁপড়ের অভাব নেই। বড় লাল পিঁপড়ে আম, জাম প্রভৃতি গাছে পাতা দিয়ে বাসা তৈরি করে বাস করে। বাড়িতে বড় বড় কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ে দেখা যায়। ভাঁড়ারে প্রায় সব

সময়ই, বিছানায় বা কাপড়-চোপড়ে মাঝে মাঝে ছোট ছোট লাল পিঁপড়ের উপদ্রব ভোগ করতে হয়। এরা ছাড়া আরও নানারকমের পিঁপড়ে আমরা দেখতে পাই।

সাধারণত আমরা যেসব পিঁপড়ে দেখি তাদের **শ্রমিক-পিঁপড়ে** বলে। এদের ডানা নেই। **পুরুষ** আর **স্ত্রী** পিঁপড়ের দুজোড়া করে পাতলা ডানা আছে। স্ত্রী-পিঁপড়ে পুরুষ-পিঁপড়ের চেয়ে বড়। বৃষ্টি কেটে যাবার পর সময় সময় বাগান বা উঠানের গর্ত থেকে অনেক পাখাওয়ালা পিঁপড়ে বের হয়ে উড়তে দেখা যায়। পাখিরা এইসব উড়ন্ত পিঁপড়ে ধরে খায়। ডানা নেই এমন শ্রমিক-পিঁপড়ের সংখ্যা খুব বেশী। এদের মধ্যে বড় চেহারার পিঁপড়ে দেখা যায়; এরা **সৈনিক-পিঁপড়ে**। স্ত্রী-পিঁপড়ের একমাত্র কাজ ডিম পাড়া। কর্মীরা সকলে মিলে তাকে খাওয়ায় আর যত্ন করে। এইজন্যে একে **রানী-পিঁপড়ে** বলে। এক-একটা দলে একটা মাত্র রানী থাকে। **পুরুষ-পিঁপড়ের** কাজ বসে বসে খাওয়া। খাবারের খোঁজ করা আর বয়ে আনা শ্রমিক-পিঁপড়ের কাজ। সৈনিক-পিঁপড়ের কাজ পাহারা দেওয়া আর অন্যান্য পিঁপড়েদের রক্ষা করা।


উই ঢিপি

যেসব পিঁপড়ে মাটিতে বাস করে তারা মাটিতে একটা ছেঁদা করে ভেতরে মাটি কেটে অনেকগুলো করে ঘর তৈরি করে, আর প্রত্যেক ঘরে যাওয়া-আসার পথ রাখে। শ্রমিকেরা

খাবার বয়ে নিয়ে এসে দলের সকলকে ভাগ করে দেয়। অতিরিক্ত যে খাবার থাকে সেই খাবার অসময়ের জন্যে বাসায় সঞ্চয় করে রাখে। শ্রমিকেরা বাসায় নানা জায়গায় ডিমগুলো রেখে সেই ডিম থেকে বাচ্চা ফোটায়, আর বাচ্চাদের বড় করে তোলে।

উই—পিঁপড়ের মতো এরাও দল বেঁধে বাস করে আর এদের মধ্যেও চার শ্রেণী। এরা মাটির নিচে যে বাসা করে সেটা ভারি চমৎকার, ছোট-বড় খোপে আর যাওয়া-আসার পথে ভরতি। উইপোকা কাঠ খেয়ে এক-রকম জিনিস তৈরি করে। ঐ জিনিস বাসা তৈরি করার কাজে লাগায়। অনেক সময় বাসার ওপরের দিক্‌টা থামের মতো মাটির ওপর থাকে। উই ঢিপি বেশ মজবুত, যদিও মাটি দিয়ে এগুলো তৈরি।

মৌমাছি—মানুষেরা যেমন সকলে একসঙ্গে মিলেমিশে এক সমাজে থাকে, নিজেদের যে যে কাজ করার কথা তা করে, মৌমাছিরাও সেইরকম



রানী পুরুষ শ্রমিক

॥ মৌমাছি ॥

নিজেদের এক সমাজ যেন তৈরি করে নিয়েছে; তাদেরও যার যা কাজ সে নিয়ম মতো সেইসব কাজ করে চলেছে। আমরা যে মধু খাই সেই মধু সংগ্রহ করে একরকম পতঙ্গ যাদের আমরা বলি মধুমক্ষিকা বা মৌমাছি। মৌমাছি নামের সঙ্গে মাছি শব্দ থাকলেও সাধারণ মাছির সঙ্গে এদের বিশেষ সম্বন্ধ নেই। মাছির মাত্র একজোড়া ডানা আছে আর মৌমাছির আছে দুজোড়া।

পিঁপড়েদের মধ্যে যেমন স্ত্রী, পুরুষ বা শ্রমিক দেখা যায় এদের মধ্যেও সেইরকম স্ত্রী, পুরুষ আর শ্রমিক আছে। শ্রমিক-পিঁপড়ের ডানা নেই, কিন্তু শ্রমিক-মৌমাছির দুজোড়া ডানা আছে। স্ত্রী-মৌমাছিকে রানী বলে।

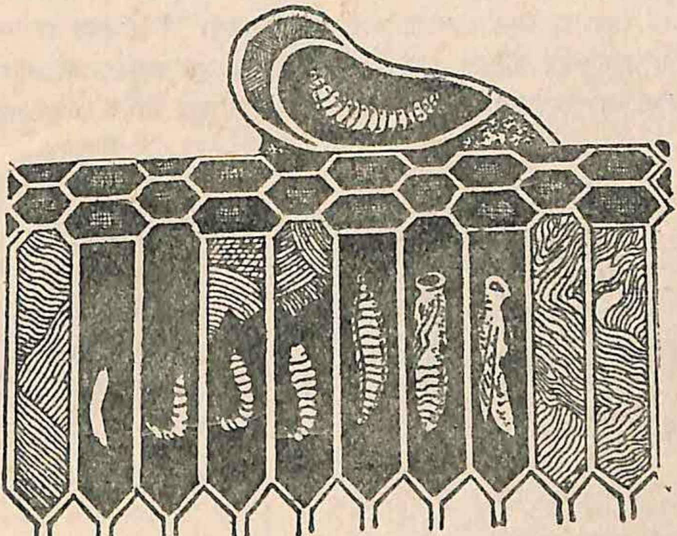
রানীর কাজ শুধু ডিম পাড়া। পুরুষ-মৌমাছিদের কাজ বসে বসে খাওয়া। শ্রমিক-মৌমাছিদের কাজ বাসা বা চাক তৈরি করা, ফুল থেকে মধু আনা, বাচ্চাদের খাওয়ার জন্যে ফুলের পরাগ বা রেণু আনা আর, তাদের যত্ন করা। মৌমাছিদের বাসার মধ্যে মধু জমান থাকে বলে এর নাম মৌচাক। তোমরা অনেকে হয়তো গাছের ডালে বা বাড়ির বারান্দার কোণে মৌচাক দেখে থাকবে। এক একটা চাকে অনেক ছোট ছোট ছয়কোনা কুঠুরি থাকে। শ্রমিক-মৌমাছিদের পেটের নিচে মোম জন্মায়; এই মোম দিয়ে এরা চাক তৈরি করে। একটা চাকে হাজার হাজার মৌমাছি থাকে। মৌচাকে মাত্র একটা স্ত্রী-মৌমাছি বা রানী থাকে আর কিছু সংখ্যক পুরুষ-মৌমাছি থাকে। বাকি সবাই শ্রমিক। মধু জমা করে রাখার কুঠুরি অনেক থাকে। ঐ মধু আমরা পিষে বার করে নিই। আরও যেসব কুঠুরি আছে তাতে ডিম আর নানা অবস্থার বাচ্চারা থাকে। শ্রমিক-মৌমাছিদের পেটের পেছনে হুল থাকে। মানুষ বা কোনো জন্তু মধু আনবার জন্যে মৌচাক ভাঙতে গেলে শ্রমিকরা দলে দলে তাকে আক্রমণ করে হুল ফুটিয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করে।



মৌচাক

মধু খেতে বেশ ভাল আর শরীরের পক্ষে উপকারী। আজকাল

কোন কোন জায়গায় মধুর জন্যে মৌমাছি পোষা হয়। মোমের তৈরী নকল মৌচাকের মধ্যে রানী আর অন্যান্য মৌমাছি রাখা হয়। মৌমাছিরা মৌচাকে যথেষ্ট মধু জমা করলে একরকম যন্ত্র দিয়ে ঐ মধু বার করে আনা হয়। এতে মৌচাক নষ্ট হয় না আর একই মৌচাক থেকে বার বার মধু সংগ্রহ করা যায়।



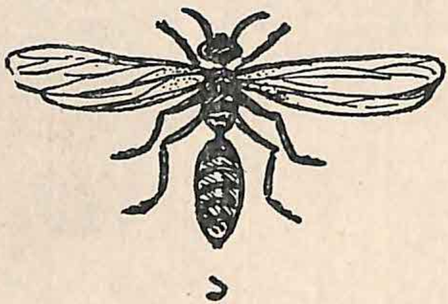
মৌচাকের মধ্যে মৌমাছির ডিম, শূককীট আর গুটি

বোলতা—তোমরা অনেকেই বোলতা দেখেছ। ঘরের কোণে বা বাগানে এদের বাসা বাঁধতে দেখা যায়। বোলতা একরকম হলদে রঙের পতঙ্গ। এর বুক আর পেটের মাঝখান বেশ সরু।

বোলতা ছোট-বড় নানা আকারের চাক তৈরি করে। এইরকম থাকবার জায়গা একা একা তৈরি করা সম্ভব নয়, তাছাড়া একজনের জন্যেও

ওরকম থাকার জায়গার দরকারও নেই। ছোট চাকে আট-দশটা আর বড় চাকে আরও বেশী বোলতাকে দল বেঁধে একসঙ্গে কাজ করতে দেখা যায়।

মৌমাছির মতো এদের গায়ে মোম নেই। কাজেই বাসা তৈরির জন্যে এদের অন্য মালমসলা যোগাড় করতে হয়। ধারাল চোয়াল দিয়ে কাঠ গুঁড়ো করে মুখের লালা দিয়ে এরা কাগজের মতো একরকম জিনিস তৈরি করে আর তা দিয়ে বোলতা বাসা গড়ে তোলে। বাসা গড়ে তোলায় বোলতারা খুব বুদ্ধির পরিচয় দেয়। বাসার কুঠরিগুলো ছয়কোনা। মৌমাছির মতো বোলতাদের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ আর শ্রমিক দেখা যায়;



১

বোলতা



২

বোলতার চাক

আর তাদের কাজও মৌমাছিদের স্ত্রী, পুরুষ আর শ্রমিকদের কাজের মতো। বোলতা খুব ছোট ছোট পোকামাকড়, ফুলের মধু, ফলের রস প্রভৃতি খায়। শ্রমিক-বোলতা পোকামাকড় টুকরো টুকরো করে কেটে বাচ্চাদের খাওয়ায়।

মৌমাছির মতো বোলতার সামাজিক জীবন অত উঁচু স্তরের নয়। মৌমাছিরা অভাবের দিনের জন্যে মধু যোগাড় করে জমিয়ে রাখে; বোলতারা এরকম কিছুই করে না। যখন অনেক খাবার, যেমন ফুলের

মধু, ফলের রস, ছোট ছোট পোকা ইত্যাদি জোটে তখন খুব আনন্দে দিন কাটায়। শীতকালে এইসব খাবার যখন সহজে পাওয়া যায় না অনেক বোলতাই তখন না খেতে পেয়ে মারা যায়।

অপকারী কীট-পতঙ্গ : মশা, মাছি ইত্যাদি পতঙ্গ রোগের জীবাণু ছড়িয়ে মানুষের খুব ক্ষতি করে। এ ছাড়া গাছপালা আর ফলফসলের ক্ষতি করে এমন অনেক রকমের কীট-পতঙ্গ আছে, যেমন **গঙ্গাফড়িং** আর **পঙ্গপাল** আর **গান্ধীপোকা**।

গঙ্গাফড়িং—এরা এখানকার সাধারণ ফড়িং। ধানের খেতে গঙ্গাফড়িং বেশী থাকে। রঙ সবুজ বলে এদের সহজে দেখা যায় না। পেছনের পা জোড়া বেশ লম্বা বলে এরা লাফ দিয়ে বেশ খানিকটা দূরে যেতে পারে। মাথার ওপর একজোড়া লম্বা শুঁড়। মুখের ভেতর ধারাল মাড়ি থাকায় গাছের কচিপাতা খেয়ে এরা ফসলের অনিষ্ট করে। পাখি আর ব্যাঙ এদের বিশেষ শত্রু। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে যে সব পাখির বাচ্চা পোষা হয়, তাদের গঙ্গাফড়িং ধরে খাওয়ান হয়।



গঙ্গাফড়িং

পঙ্গপাল—এদের মাথার শুঁড় গঙ্গাফড়িংয়ের চেয়ে ছোট। গায়ের রঙ বাদামী, তাতে কাল দাগ বা ডোরা থাকতে পারে। এরা একসঙ্গে অনেকে বাস করে। হাজার



পঙ্গপাল

হাজার, এমন কি লক্ষ লক্ষ পঙ্গপাল নিয়ে এক একটা দল। এরা এক-জায়গা থেকে দলবেঁধে উড়ে অন্য জায়গায় যায়। পঙ্গপালের দল যখন আকাশ দিয়ে উড়ে চলে তখন মনে হয় যেন একটা কালো মেঘ ভেসে আস্‌ছে। এরা কোনো খেতের ওপর দিয়ে গেলে সেখানকার একটি গাছও আস্ত রাখে না। আমাদের দেশে মাঝে মাঝে পঙ্গপালের ঝাঁক এসে ফসলের খুব অনিষ্ট করে।

কীট-পতঙ্গের শত্রু : মানুষ নানারকমের ওষুধ ব্যবহার করে, যেসব কীট-পতঙ্গ বা পোকামাকড় আমাদের অনিষ্ট করে তাদের মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছে। মশা, মাছি, পিঁপড়ে, উই, নানা জাতের শূককীট ইত্যাদি যে মানুষের হাতেই শুধু মারা যাচ্ছে তা নয়; তাদের অন্যান্য শত্রুও আছে। শুঁয়োপোকা যেভাবে লতাপাতা বা শাক-সবজির অনিষ্ট করে তাতে শুঁয়োপোকার শত্রুরা যদি তাদের না মেরে ফেলত তাহলে আমাদের খাবারের অভাব আরও অনেক বেড়ে যেত। শুঁয়োপোকা পাখিদের খুব প্রিয় খাবার। পাখিরা ছাড়া জলফড়িং, কুমোরে পোকা, ডাইন ফড়িং প্রভৃতিরা যেসব পোকামাকড় আমাদের অপকার করে তাদের সব সময়ই খেয়ে শেষ করছে। এদের সম্বন্ধে এখানে বলা হচ্ছে।



জলফড়িং

জলফড়িং—পুকুর, খানা, ডোবা ইত্যাদি জায়গায় যেখানে জল আছে তাদের ধারে জল-ফড়িংকে উড়তে বা খুঁটির ওপর ডানা ছড়িয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। এদের ডানা চারখানা খুব পাতলা, কাচের মতো স্বচ্ছ আর সরু শিরার জালে ভরতি। শরীরটা সরু আর লম্বা। ছোট ছোট পোকা, মশা, মাছি, এদের খাবার। জলফড়িং উড়ে বেরিয়ে এদেরই খোঁজ করে। কাছে কোন পোকা উড়তে দেখলে জলফড়িং চিলের মতো ছোঁ মারে আর ছখানা পা দিয়ে তাকে

ধরে ফেলে; তারপর উড়তে উড়তেই শিকার মুখে পুরে খেতে থাকে।

জলফড়িংয়ের জীবনের কথা বড়ই অদ্ভুত। ডিম পাড়বার সময় স্ত্রী-ফড়িং পুকুরের ধারে গিয়ে জলে ডুব দেয়। জলের তলায় শেওলার গায়ে বা কাদার মধ্যে ডিম পেড়ে ওপরে উঠে আসে। জলের তলায় ডিম থেকে যে শূককীট হয়, তারা ছোট ছোট পোকা ধরে খায়। বছর-খানেক জলে থাকার পর ডানা গজালে এরা ডাঙায় উঠে আসে। জীবনের প্রথম দিক্‌টা জলের নিচে কাটায় বলে এদের জলফড়িং বলে। জল-ফড়িংয়ের ভয়ে ডাঙায় পোকা-মাকড় অস্থির; জলে বাচ্চারাও কম যায় না। অনবরত মানুষের অপকারী পোকা-মাকড় নষ্ট করছে বলে জলফড়িং মানুষের এক বিশেষ উপকারী পতঙ্গ।



১ ২ ৩

১। কুমোরে পোকা ২। কুমোরে পোকা মাকড়সা ধরে বাসায় নিয়ে যাচ্ছে ৩। কুমোরে পোকা মাটি দিয়ে ঘর তৈরি করছে

কুমোরে পোকা—একটু লক্ষ্য করলেই তোমাদের আশেপাশে বোলতার মতো চেহারার একরকমের পতঙ্গ দেখতে পাবে। এরা বোলতার মতো দল বেঁধে থাকে না; এক-একটা পোকা নিজেদের বাচ্চার জন্যে

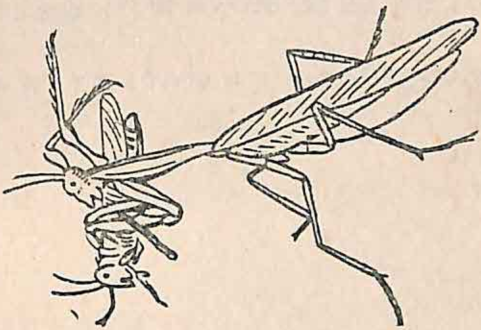
মাটি দিয়ে দেওয়ালের গায়ে, দরজা-জানলা আর কপাটের ওপর ঘর তৈরি করে। কাছাকাছি কোন জায়গার মাটি থেকে কাদার বড়ি তৈরি করে, সেগুলো বয়ে এনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটা গোল সরু-গলা মাটির ঘর তৈরি করে ফেলে। এই জন্যেই এদের কুমোরে পোকা বলে।

কুমোরে পোকা এক-একটা ঘরে একটা একটা করে ডিম পাড়ে। তারপর ছোট ছোট শুঁয়োপোকা, পতঙ্গ, মাকড়সা ইত্যাদি ধরে এনে ঐসব ঘরে জমা করে। এইভাবে বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করে ঐ বাসার বা মাটির ঘরের মুখ বন্ধ করে দেয়। বোলতা বা মৌমাছিরা যেমন যত্ন করে বাচ্চাদের বড় করে তোলে কুমোরে পোকা তা করে না। বাচ্চার জন্যে খাবার জমা রেখে চলে যায়, আর খোঁজ নিতেও আসে না। ডিম থেকে বাচ্চা বের হয়ে জমা খাবার খায়। তারপর বড় হলে বাসার দেওয়াল ছেঁদা করে বেরিয়ে আসে। আমাদের অপকারী পোকামাকড় নষ্ট করার কাজে কুমোরে পোকা খুবই সাহায্য করে।

ডাইন-ফড়িং—এরা বেশ মজার জীব। গঙ্গাফড়িংয়ের পেছনের পা জোড়া বেশ লম্বা, সে লাফও দিতে পারে খুব লম্বা।

ডাইন ফড়িংয়ের সামনের পা-জোড়াও খুব লম্বা আর মজবুত। এই পা-জোড়া একসঙ্গে ওপরের দিকে তোলা থাকে দেখে মনে হয় যেন হাতজোড় করে প্রার্থনা করছে। গায়ের রঙ সাধারণত সবুজ, কখনও কখনও গাছের ছালের মতোও হয়। সেজন্যে সহজে এরা চোখে পড়ে না। সরু লম্বা গলার ওপর মাথাটা বসান। আমরা যেমন ঘাড় ফিরিয়ে দেখি এরাও তেমনি ঘাড় বেঁকিয়ে শিকার দেখে নেয়। সামনের পা-জোড়া লম্বা সাঁড়াশির মতো; তাতে করাতের দাঁতের মতো খাঁজ কাটা আছে। এরা যখন সামনের পা-জোড়া তুলে যেন প্রার্থনা করছে এরকম থাকে তখন এদের আসল উদ্দেশ্য শিকার ধরা। ছোট পোকা-মাকড় বা মাছি সামনে এলে সঙ্গে সঙ্গে কাঁটা লাগানো পা বাড়িয়ে মুড়ে ফেলে আর

পোকা সেই কাঁটার মধ্যে আটকে যায়। তারপর পোকাকে আস্তে আস্তে খেয়ে ফেলে। এদের বেশ সুন্দর দেখতে আর এরা কিছুটা পোষও মানে। যদি হাতের ওপর রাখ চেনা হয়ে গেলে তোমার হাতের ওপর



ডাইন ফড়িং শিকার ধরেছে

স্বচ্ছন্দে বসে থাকবে। এই পতঙ্গের হাবভাব, মাথা আর ঘাড়-ঘোরান সাপের মতো বলে কোন কোন জায়গায় একে **সাপের মাসী** বলে। এরা খুব আস্তে আস্তে চলে, সেজন্যে জলফড়িং বা কুমোরে পোকার মতো খুব বেশী পোকা-মাকড় মারতে পারে না।

উত্তর লেখ

১। প্রজাপতিদের জন্মকথা ছবি এঁকে বুঝিয়ে লেখ। কতরকমের প্রজাপতি দেখেছ বা সংগ্রহ করেছ?

২। মৌমাছিরা কিভাবে জন্মায়, বড় হয়, কাজ করে ইত্যাদি সব ছবির সাহায্যে লেখ।

৩। মৌমাছি আর বোলতার জীবনে কি কি মিল বা অমিল দেখা যায়? একটা বোলতার চাক সাবধানে সংগ্রহ করে তার ভেতরে কি আছে, সেটা কিরকম দেখতে লেখ।

৪। পিঁপড়েরা আর মৌমাছিরা কিভাবে জীবন কাটায় তা লেখ। এদের সামাজিক প্রাণী বলে কেন?

৫। ফসলের অনিষ্ট করে এমন কীট-পতঙ্গ কি কি? এদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৬। কোন্ কোন্ কীট-পতঙ্গ মানুষের উপকারী? ছবি এঁকে এদের সম্বন্ধে লেখ।

৫

পাখি

পাখি ছোট, বড় আর নানা রঙের দেখা যায়। বিভিন্ন রকমের পাখির ডাকও আলাদা। পাখির দেহে সামনের দিকে এক জোড়া ডানা, পেছনে লেজ আর এক জোড়া পা আছে। এদের দেহ ছোট-বড় পালকে ঢাকা। ডানার সাহায্যে প্রায় সব পাখিই উড়তে পারে। কোন কোন পাখি জলে সাঁতারও দিতে পারে। জলে, ডাঙগায়, আকাশে সব জায়গাতেই পাখিদের দেখতে পাওয়া যায়। সব পাখির স্বভাবও এক নয়। কতকগুলো পাখি যেন নেচে নেচে বেড়ায়, কিছু পাখি গান গেয়ে বা ডেকে ডেকে দিন কাটায়, আবার কোন কোন পাখি আকাশে উড়ে বা ওতপেতে বসে শিকারের সন্ধান করে। যদি তোমরা কোন অচেনা পাখি দেখ তো চেনবার চেষ্টা করো। এ বিষয়ে পাখির চেহারা, গায়ের রঙ, গলার স্বর ইত্যাদি তোমাদের খুব সাহায্য করবে। পাখি চেনা

হয়ে গেলে তার বাসা, ডিম প্রভৃতির সম্বন্ধেও খোঁজ নেবে আর সমস্ত বিবরণ একখানা খাতায় লিখে রাখবে। পাখিদের জানবার চেষ্টা বা ঐ বিষয় নিয়ে সময় কাটানো দেখবে বেশ ভালই লাগবে; তাছাড়া এর থেকে অনেক কিছুই শিখবে।

বাড়ি আর তার আশেপাশে যে সব পাখি দেখা যায় তাদের কথা আগেই বলা হয়েছে। এবারে আরও কয়েকটা পাখি সম্বন্ধে কিছু বলা যাক।

দোয়েল : চড়ুই পাখির মতো এদের দেহের গঠন গোলগাল, তবে লেজটা আরও লম্বা। পুরুষ দোয়েলের মাথা, গলা আর পিঠের রঙ চকচকে কালো, পেটের দিকের রঙ সাদা। লেজের তিন-চারটে পালক কাল, বাকীগুলো সাদা। সাদায় আর কালোয় পাখিটাকে খুব সুন্দর দেখায়। স্ত্রী-দোয়েলের রঙে বিশেষ চাকচিক্য নেই। খুব ভোরে বাড়ির আশেপাশে যখন দোয়েল শিস দিয়ে ডাকে বা গান করে তখন খুব সুন্দর শোনায়।

গাছের কোটরে, দেয়ালের ফাঁকে বা ঝোপের মাঝে খড়-কুটো দিয়ে দোয়েল পাখি মালসার মতো বাসা তৈরি করে ডিম পাড়ে। এরা পোকা, ফড়িং ইত্যাদি ধরে খায়। দোয়েল জোড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে মাটিতে হাঁটে আর লেজ ওঠাতে বা নামাতে পারে। এরা পোষ মানে।

বুলবুল : এরা কয়েক রকমের। আমরা সাধারণত যে বুলবুল দেখতে পাই তার মাথায় কালো ঝুঁটি আছে। এইজন্যে একে সেপাই বুলবুল বলে। এদের চোখের পাশে ছোট ছোট সাদা পালক আছে। ডানার রঙ ছাই ছাই বা ধূসর; ডগার দিক্ কাল, মলদ্বারের চারদিকের নরম পালক গাঢ় লাল রঙের।

বুলবুল পাকা ফল খেতে ভালবাসে। পোকা আর ফড়িং ধরেও খায়। এরা নিচু ঝোপে পেয়ালার মতো বাসা তৈরি করে তাতে ডিম পাড়ে। বুলবুল পাখি সহজে পোষ মানে। এদের স্বরও বেশ মিষ্টি।

টিয়া : সবুজ রঙের এই পাখিটি বনে জঙ্গলে প্রায়ই দেখা যায়। অনেকে টিয়া পোষে। টিয়ার ঝাঁক যখন চেঁচামেচি করে উড়ে যায় তখন এদের আকাশে সবুজ পাথরের মালার মতো সুন্দর দেখায়। টিয়ার ঠোঁট লাল, ওপরের ঠোঁট নিচের ঠোঁটের চেয়ে অনেক বড় আর বঁড়শির মতো বাঁকানো। গাছের কোটরে বা দেওয়ালের ফাঁকে এরা বাসা বাঁধে। বড় দেখতে এক ধরনের টিয়া আছে; এদের লেজ প্রায় ১০ ইঞ্চি লম্বা। এদের গলার পেছন দিকে গোলাপী রঙের একটা সরু বেড় থাকে; এর থেকে দুটো কাল দাগ দুদিকে ঠোঁট পর্যন্ত থাকে। প্রত্যেকের কাঁধের ওপর লাল দাগ—এদের বলা হয় **চন্দনা**। এরা সহজেই কথা বলতে শেখে। যে যা বলে সব নকল করতে পারে।


টিয়া

ময়না : অনেক জাতের ময়না আছে। নানা রকমের শালিকও ময়না বলে পরিচিত। এখানে যে ময়নার কথা বলা হচ্ছে তা হল পাহাড়ী ময়না; অনেকে অবশ্য একে শুধু ময়না বলে। এরা পাহাড়ে জায়গায় থাকে। বাজার থেকে আসামী বা সিঙ্গাপুরী ময়না কিনে লোকে পোষ মানায়। নীলচে আভা আছে এমন কাল পালকে এদের শরীর ঢাকা। চোখের ওপর আর নিচে উজ্জ্বল হলদে রঙের চামড়া আছে—তাতে কোন পালক নেই। ঠোঁট লালচে হলদে আর পা ফিকে হলদে। ময়নাজাতের পাখিরা শস্যের ক্ষতি করে এমন

সব পোকামাকড় খেয়ে আমাদের উপকার করে। পোষা ময়নাকে দুধ, ভাত, ছাতু, ফল ইত্যাদি খাওয়ান হয়। ময়না খুব তাড়াতাড়ি অন্যের স্বর নকল করতে পারে। এরা মানুষের স্বরে কথা বলে, হাসে,



ময়না

ভিখিরীদের ডাকের নকল করে ভিক্ষে দিতে বলে। অন্য পাখির ডাকও এরা নকল করতে পারে।

কোকিল : কোকিল ডাকে কুহু কুহু করে। এই স্বর বা ডাক ভারি মিষ্টি। সেই জন্যে সব দেশের লোকই কোকিল ভালবাসে।

কোকিলেরও কাল রঙের ওপর নীলের আভা থাকায় বেশ দেখতে লাগে। চোখ দুটো তার ওপর লাল। স্ত্রী-কোকিলের চেহারা কিন্তু এরকম নয়, আর দেখতেও এত সুন্দর নয়; এদের শরীরে ছাই রঙের ওপর সাদা ছিট আছে। স্ত্রী-কোকিলের স্বরও আলাদা।

কোকিল খুব কুড়ে পাখি; পাতার আড়ালে বসে গান গেয়ে দিন কাটায়—বাসা তৈরি করার চেষ্টা নেই। কাক যখন খাবারের খোঁজে বাসা থেকে দূরে থাকে আর স্ত্রী-কাক ডিমে তা দেয়, স্ত্রী-কোকিল তখন আশেপাশে ঘুরে বেড়ায় আর পুরুষ-কোকিল কাছাকাছি কোনো

জায়গায় বসে কুহু কুহু করে অনবরত ডাকে। স্ত্রী-কাক তখন বিরক্ত হয়ে বাসা ছেড়ে কোকিলের পেছনে তাড়া করে। স্ত্রী-কোকিল এই সুযোগে কাকের বাসায় এসে দু-একটা ডিম পাড়ে আর কাকের দু-একটা ডিম মাটিতে ফেলে দেয়। স্ত্রী-কাক ফিরে এসে আপন মনে ডিমে তা দেয়। পরে কাকের বাসাতেই কোকিলের ছানার জন্ম হয়। একটু বড় হলেই বাচ্চাদের যার যে রকম রঙ ফুটে ওঠে, ডাকও আলাদা হয়; তখন কাক কোকিলের বাচ্চা চিনতে পেরে বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয়।

শীতপ্রধান দেশে শীতের সময় কোকিল দেশ ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। আমাদের দেশে কোকিল বার মাসই থাকে। অনেকের



কোকিল (পুরুষ)



পাপিয়া

বিশ্বাস বার মাসই কোকিল ডাকে না—এটা ঠিক নয়। ফাল্গুন মাস থেকে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত কোকিলের ডাক বেশী শোনা যায়, অন্য সময় কমই ডাকে।

পাপিয়া : পাপিয়া কোকিল জাতের পাখি। কোকিলের মতোই পাতার আড়ালে লুকিয়ে ডাকে, ফাঁকা ডালে প্রায়ই বসে না; কিন্তু

দেখতে কোকিলের মতো নয়। গায়ের পালকে ছাইয়ের আভা গেরি মাটির ওপর পড়লে যে রকম দেখায় সেই রকম রঙ; তার ওপরে কালচে ডোরা। মুখের আর দেহের গঠন শিক্‌রে বা শিক্‌রা পাখির মতো অনেকটা। শিক্‌রে, বাজের চেয়ে ছোট একরকম শিকারী পাখি। পাপিয়ার ডাক শুনতে খুব ভাল লাগে। কোকিলের ডাক একটানা কিন্তু পাপিয়ার ডাকে ওঠানামা আছে। পাপিয়া ডাকলে শুনতে লাগে—'পি—পী—আ'——'পি—পী—আ'——দ্বিতীয় 'পী'র ওপর জোর দিয়ে। নিচু সুরে ডাকতে আরম্ভ করে পাপিয়া সুর চড়িয়ে খুব উঁচু সুরে তোলে। পরে আবার যেন ডাকে—'চোখ গেল'—'চোখ গেল'। রাত্রিতেও পাপিয়া ডাকে। এদের নাম ডাক অনুসারে হয়েছে। অনেকে এদের 'চোখ গেল' পাখিও বলে।

কোকিলের মতো এরাও বাসা বাঁধে না, ছাতারে বা সাতভাই পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে এদের ডাক না শুনে লোকে মনে করে এরা বুঝি অন্য জায়গায় চলে গেছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। বার মাসই এরা এদেশে বাস করে।

বৌ-কথা-কও : এই পাখিও কোকিল জাতের। এদের ডাক শুনলে 'বৌ-কথা-কও' বলছে এই রকম মনে হয়। শরীরের ওপর দিক্‌ ছাই ছাই রঙের, নিচের দিক্‌ পিঙ্গল। কোকিলের মতো এরাও বাসা বাঁধে না; ফিঙে পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। শীতকালের আগে এরা অন্য জায়গায় চলে যায় আর বসন্তকালে আবার এসে হাজির হয়।

কাঠ-ঠোক্‌রা : বাগানে গাছের গায়ে নখ আটকে আর লেজ দিয়ে গাছে ভর করে এরা গাছের ওপর ঠোক্কর মারে। এইজন্যে এদের নাম কাঠ-ঠোক্‌রা। এদের ঠোঁট খুব লম্বা আর মজবুত; আর ঠোক্করের জোরও খুব, হাতুড়ি আর বাটালি দিয়ে কাঠ কাটার মতো। বাড়ির পাশে বাগানের ভেতর এদের ঠোক্করের ঠক্‌ ঠক্‌ শব্দ ঘরে থেকেও শোনা

যায়। গাছের খাড়া গ‍ুঁড়ির ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এরা অনায়াসে ওপরে উঠ্‌তে পারে।

কাঠ-ঠোক্‌রা অনেক রকমের আছে। পশ্চিম-বাংলায় যে কাঠ-ঠোক্‌রা দেখা যায় তা আট নয় ইঞ্চি লম্বা। পুরুষ আর স্ত্রী দু-পাখিরই মাথায় লাল ঝুঁটি, স্ত্রী-পাখির কপাল কাল; পুরুষের সে দিক্‌টা লাল। এদের ঘাড় কাল, পিঠ উজ্জ্বল সোনালী রঙের। মাথায় লাল ঝুঁটি আর সোনালী রঙের পিঠের জন্যে এই পাখিকে খুব সুন্দর দেখায়। গাছের শুকনো আর পচা ছালের নিচে যেসব পোকা-মাকড় থাকে সেইসব এদের খাবার। ঠোঁটের জোর ঠোক্করে পোকামাকড় সব বেরিয়ে আসে। তখন এরা লম্বা জিভ দিয়ে ধরে এদের খায়। বাসা তৈরির জন্যে এরা গাছের গুঁড়িতে গর্ত করে। এদের ওড়বার ক্ষমতা খুব বেশী নয়। কোন গাছে এদের কাজ শেষ হয়ে গেলে একরকম কর্কশ আওয়াজ করতে করতে উড়ে যায়।



বসন্ত-বউরি

বসন্ত-বউরি : গরমের দিনে বাগান থেকে যখন অনবরত 'টুঙ্‌-টুঙ্‌' শব্দ আসতে থাকে, তখন মনে হয় কামারের হাতুড়ি পেটার আওয়াজ হচ্ছে। তবে, শব্দটা অত জোরে হয় না। শব্দ শোনা যায়, কিন্তু পাখি খুঁজে বার করা কঠিন। এই পাখি আকারে চড়ুই পাখির চেয়ে সামান্য বড়। ডাক শুনলে মনে হয়, কত বড় পাখিই না ডাকছে। শরীরের রঙ সবুজ, বুকের দিক্‌ লাল। এত রঙের বাহার থাকলে কি

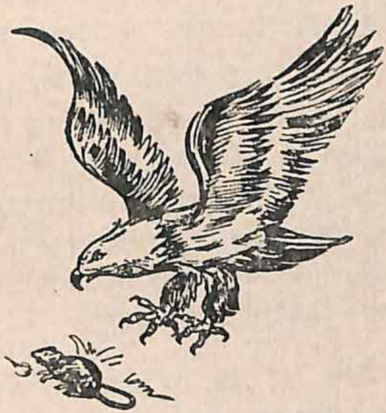


কাঠঠোকরা

হয়—চেহারাটা বোকা বোকা। ঠোঁট মোটা, আবার তার গোড়ায় বেড়ালের মতো গোঁফ রয়েছে।

আর এক ধরনের বসন্ত-বউরি আছে, যারা চেহারায় বড়—প্রায় নয় ইঞ্চি লম্বা। এর ডাক—'কুটর্-কুটর্' করে অনবরত চলতে থাকে। বসন্ত-বউরি গাছে গাছেই দিন কাটায় আর ফলই এদের প্রধান খাবার। খুব গরমের দিনে কলকাতা শহরেও রাস্তার পাশে গাছ থেকে এদের ডাক শোনা যায়।

মাছরাঙা : পুকুর, বিল বা ডোবার ধারের গাছে এই পাখিকে চুপ করে বসে থাকতে দেখবে। জলের মধ্যে ছোট মাছ ভেসে উঠতে দেখলেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর তুলে নিয়ে আসে। এর ঠোঁট লম্বা আর লেজ ছোট। এর দেহ নীল রঙের, ডানা দুটোতে নীলের ওপর সবুজের আভা রয়েছে। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় উঠে যাবার সময় খুব জোরে বাঁশির আওয়াজের সুরে এরা ডাকে। নদী বা পুকুরের ধারে সুড়ঙ্গের মতো জায়গায় মাছরাঙা থাকে।



বাজ পাখি ছোঁ মেরে শিকার ধরছে

বাজ : চিল, শকুনি, পেঁচা ইত্যাদি শিকারী পাখির কথা আগেই দেওয়া হয়েছে। এবার বাজ আর শিক্‌রে বা শিক্‌রা পাখির কথায় আসা যাক। বাজ সব সময় দেখা যায় না। ঝোপের আড়ালে, গাছের

১১

পাতাঘেরা ডালে এরা শিকারের জন্যে বসে থাকে। এদের রঙ সাধারণ চিলের মতো, আকারে চিলের চেয়েও বড়; ডানা লম্বা, লেজ ছোট, আর আঙ্গুল পর্যন্ত পা পালকে ঢাকা। অন্য পাখিরা বাজকে ভয়ানক ভয় করে। এরা আকাশে অন্য পাখিদের আর মাটিতে ব্যাঙ, ইঁদুর, হাঁস ইত্যাদি ছোঁ মেরে শিকার করে।

শিক্‌রে বা শিক্‌রা : এরা বাজের চেয়ে আকারে ছোট, পায়রার চেয়ে বড় নয়, অথচ খুব জোর আছে আর প্রকৃতিও ভীষণ। এরা খুব জোরে ছোঁ মারতে পারে আর শিকার এদের হাত থেকে খুবই কম ফস্কায়। নখ বাঘের নখের মতো বাঁকা আর ধারাল, ঠোঁটও যেন বাঘের একটা বড় নখ। হাঁস, পায়রা ইত্যাদি এদের শিকার। শিকারীরা শিক্‌রা পুষে বুনো হাঁস, বক ইত্যাদি শিকার করে।

হাঁস : অনেক রকমের হাঁস আছে; বনেজঙ্গলে এরা বাস করে আর নদীনালা, খাল, বিল প্রভৃতিতে চরে বেড়ায়। পাতিহাঁস আর রাজহংস লোকে পোষে। হাঁসের পায়ের সামনের তিনটে আঙ্গুল একটা পাতলা চামড়া দিয়ে জোড়া—এইজন্যে হাঁস বেশ ভাল সাঁতরাতে পারে। এরা ডাঙ্গায় তাড়াতাড়ি চলতে পারে না, হেলে দুলে চলে। ডিম আর মাংস খাওয়ার জন্যে লোকে পাতিহাঁস পোষে। বড় বড় হাঁসকে রাজহাঁস বলে। এদের ডাক খুব কর্কশ।

বক : বক নানা রকমের। কোচ বক লম্বা গলা গুটিয়ে পুকুরের ধারে একা-একা শিকার ধরবার জন্যে বসে থাকে। শরীরের তুলনায় এদের ঠোঁট আর পা লম্বা। গায়ের রঙ মেটে, তাতে সবুজের আভা থাকে। বসে থাকলে এদের গায়ের রঙ পাশের কাদামাটির সঙ্গে প্রায় মিশে যায়। উড়ে যাওয়ার সময় এদের সাদা দেখায়।

গো-বক বা গাই-বগ্‌লা : এরা ফুটফুটে সাদা। ঠোঁট লালচে হলদে আর পা কালো। এরা মাঝে মাঝে গরু বা মোষের পেছন পেছন

থাকে। গরু-মোষ চরতে থাকলে ঘাসের মধ্যে থেকে পোকা-মাকড় বেরোয়। এরা ঐসব পোকা-মাকড় ধরে খায়।

উত্তর লেখ

১। কয়েকটা গায়ক পাখি, শিকারী পাখি আর জলচর পাখির নাম কর।

২। তুমি খুব পছন্দ কর এমন দুটো পাখির ছবি এঁকে তাদের সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। কোন্ কোন্ পাখি বাসা তৈরি করে না? তারা কোথায় ডিম পাড়ে?

৪। পাখি চেনবার কি কি উপায় তোমার জানা আছে? এভাবে তুমি কোন্ কোন্ পাখি চিনতে পেরেছ?

৫। কয়েকটা পাখির বাসা সংগ্রহ করে সেই বাসা সম্বন্ধে যা দেখেছ লেখ।

৬। কোন্ কোন্ পাখি শিকার করে? এরা কিভাবে শিকার করে লেখ।

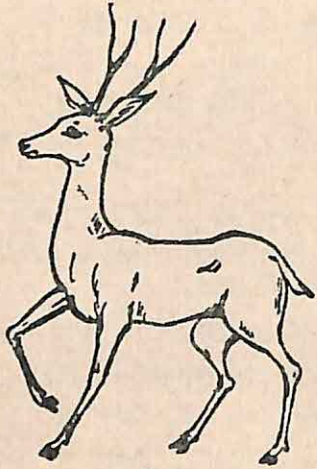
৭। হাঁস আর বক সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৬

স্তন্যপায়ী জীব

আমরা সাধারণত কুকুর, বেড়াল, গরু মোষ, ঘোড়া, ছাগল, ভেড়া, ইঁদুর, খরগোশ ইত্যাদি স্তন্যপায়ী জন্তু দেখতে পাই। এসব ছাড়া এমন কতকগুলো অদ্ভুত ধরনের স্তন্যপায়ী জন্তু আছে যাদের আমরা আশেপাশে কমই দেখতে পাই। তোমরা আলিপুরের পশুশালায় বেড়াতে গেলে অনেক রকমের জন্তু দেখতে পাবে।

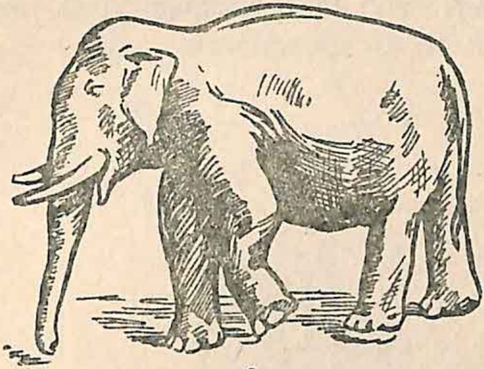
হরিণ : এরা খুব নিরীহ প্রাণী; বেশির ভাগই ঘাসপাতা খেয়ে বেঁচে থাকে। হরিণরা খুব জোরে দৌড়াতে পারে। সুন্দরবনে বা অন্যান্য জায়গায় নানারকমের হরিণ আছে। বাঘ এদের শত্রু। অনেকে হরিণ পোষে।



হরিণ

হাতি : আজকাল পোষা হাতির সংখ্যা অনেক কম। হাতি বিরাট্ আকারের জন্তু। মোটা থামের মতো চারটে পা বিশাল দেহের ভার বইছে। ডাঙগায় যেসব জীব আছে তাদের মধ্যে হাতিই সব থেকে বড়। হাতির লম্বা শুঁড় হল এদের নাক। হাতির মুখের ভেতর দাঁত আছে। তাছাড়া পুরুষ হাতির মুখ থেকে একজোড়া সাদা লম্বা দাঁত বের হয়। হাতির দাঁত থেকে নানারকমের দামী দামী শৌখিন জিনিস তৈরি হয়। এরা কলাগাছ, ঘাস, ধান ইত্যাদি খায়।

গণ্ডার : সারা ভারতে এখন প্রায় শ' চারেক গণ্ডার আছে। জলপাইগুড়ি জেলায় জন্তু-জানোয়ারদের রক্ষা করবার জন্যে যে বন আছে তাতে প্রায় ৫০টা গণ্ডার আছে। ঐ সব বনে বুনো হাতি আর বুনো মোষও আছে। গণ্ডারের গায়ের চামড়া খুব পুরু। এর নাকের ওপর খড়্গের মতো একটা শিং আছে; কোন কোন গণ্ডারের দুটো শিংও থাকে। এর সাহায্যে গণ্ডার অন্য জন্তুকে আক্রমণ করে। এদের প্রত্যেকটা পায়ে তিনটে করে খুর আছে। গণ্ডার কচি ঘাস, নল-খাগড়া ইত্যাদি জলজ উদ্ভিদ্ খায়। এরা জঙ্গলে জলার মধ্যে থাকতে ভালবাসে।



হাতি



গণ্ডার

জিরাফ : এদের পা, বিশেষ করে গলা খুবই লম্বা। এইজন্যে আট-দশ হাত উঁচু গাছের কচি পাতা সহজেই খেতে পারে। এরা সামনের দু-পা ফাঁক করে, নিচু হয়ে ঘাস, পাতা খায়। এদের গায়ের রঙ হলদে

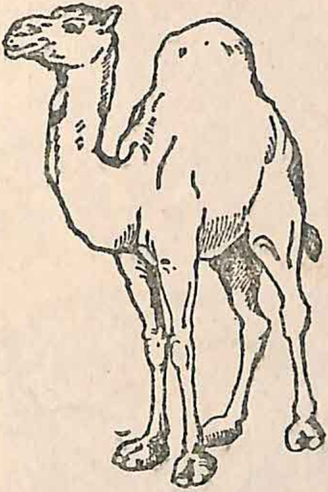
আর তার ওপর খয়েরী ছোপ। মাথায় তিনটে ছোট শিং আছে। আফ্রিকার বনে এরা দলে দলে বাস করে।



জিরাফ

উট : উটের চেহারা অদ্ভুত রকমের। এর পিঠে কুঁজ, পা চারটে লম্বা, আর গলা বাঁকানো আর লম্বা। গাছের ডাল পাতা এদের খাবার উটের পায়ের তলায় খুব পুরু মাংসের গদি আছে। সেজন্যে এরা মরুভূমির গরম বালির ওপর দিয়েও চলতে পারে। মরুভূমিতে উটই একমাত্র বাহন। রাজস্থানে আর ভারতের অন্য কোন কোন জায়গায় উটকে মানুষের নানা কাজে লাগান হয়। ভারতের বাইরেও অনেক জায়গায় উটকে কাজে লাগান হয়।

জলহস্তী : আফ্রিকার অগভীর নদীতে, হ্রদে বা জলা জায়গায় জলহস্তী দল বেঁধে বাস করে। এরা আকারে খুব বড় আর দেখতে



উট



জলহস্তী

অনেকটা গণ্ডারের মতো। মুখটা খুব বড়—হাঁ করলে আরও বিকট
দেখায়। এদেরও শরীর বিরাট, আর জলে কাদায় থাকে বলে জলহস্তী

বলে। এদের কিন্তু হাতির মতো শুঁড় নেই। এরা এমনিতে খুব ঠান্ডা কিন্তু রেগে গেলে সাংঘাতিক। জলেতে যেসব গাছপালা হয় সেই-গুলোই এরা খাবারের জন্যে বেশী পছন্দ করে।

ক্যাঙ্গারু : ক্যাঙ্গারু কেবলমাত্র অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই পাওয়া যায়। এদের সামনের পা দুটো ছোট, পেছনের পা দুটো আর লেজ লম্বা। এরা পেছনের পা আর লেজের ওপর ভর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে। ক্যাঙ্গারুরা ছোট ছোট গাছপালা খায়। এরা খুব নিরীহ। এদের

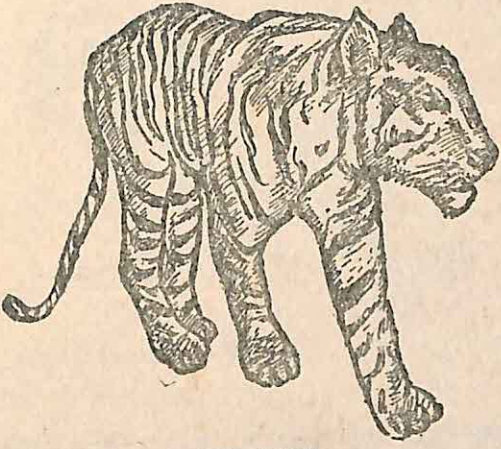


ক্যাঙ্গারু

বাচ্চারা জন্মাবার পর কয়েকমাস পর্যন্ত মা-ক্যাঙ্গারুর পেটের নিচের একটা থলির মধ্যে থাকে। ক্যাঙ্গারুরা রেগে গেলে বড় সাংঘাতিক। এদের পেছনের পায়ের জোর খুব আর ঐ পেছনের পা দিয়েই শত্রুদের আক্রমণ করে।

ব্যাঘ্র বা বাঘ : বাঘ, সিংহ, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি জন্তু যারা মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের মুখে মাংস ছেঁড়বার জন্যে অন্যান্য দাঁত ছাড়া প্রত্যেক চোয়ালের দু-পাশে দুটি করে লম্বা ধারাল দাঁত আছে। একটা কুকুর বা বেড়ালের দাঁত পরীক্ষা করলেই সেটা বোঝা যাবে। সিংহ আর

বাঘের সামনের পায়ের থাবার নখগুলো লম্বা আর বাঁকান, খুব শক্ত আর ধারাল। যে সব জন্তু গাছপালা, ঘাস ইত্যাদি খেয়ে থাকে যেমন গরু, মোষ, হাতি, গণ্ডার ইত্যাদি, তাদের মতো এদের দেহ অত বড় নয়। কিন্তু দেহের তুলনায় এদের জোর খুব বেশী। এইজন্যে গরু, মোষ, হরিণ, বরাহ ইত্যাদি শিকার অতি সহজেই ধরে মেরে ফেলতে পারে, আর দরকার হলে শিকার বয়ে বা টেনে নিয়ে যেতে পারে। বাঘ বেড়ালের



ব্যাঘ্র বা বাঘ

মতো শিকার ধরবার জন্যে ওত পেতে থাকে। তারপর সময়মতো এক লাফে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘের চোখ, পা, নখ, গোঁফ ইত্যাদিতে বেড়ালের সংগে অনেক মিল আছে। বাঘেরা খুবই হিংস্র হয়। সুন্দরবনে বা ভারতের অন্য জায়গায় যে সব বড় বড় বাঘ দেখা যায় তাদের গায়ের রং হলদে আর তার ওপর মোটা মোটা কাল ডোরা কাটা আছে। এদের রয়াল বেংগল টাইগার বলা হয়। তোমরা আলিপুরের পশুশালায় এলে এদের দেখতে পাবে।

সিংহ : সিংহের গায়ের রং পিঙল। এর মাথায়, ঘাড়ে আর গলার নিচে বড় বড় লোম বা কেশর আছে। সিংহীর কেশর হয় না। আফ্রিকাতেই বেশির ভাগ সিংহ দেখতে পাওয়া যায়। গুজরাটে গীর বলে একটা বন আছে। সেখানে ভারতের বেশির ভাগ সিংহ আছে, অবশ্য সেখানে সংখ্যায় এরা খুবই কম। সিংহও বাঘের মতো খুব

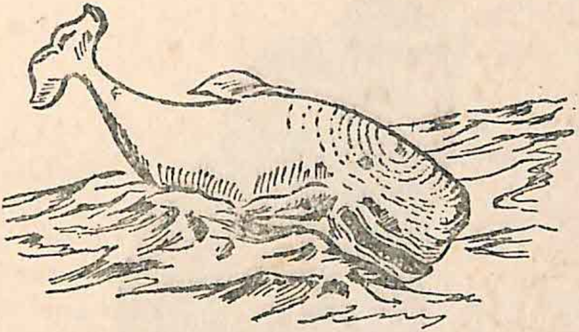


সিংহ

জোরাল, কিন্তু বাঘের মতো হিংস্র নয়। সিংহকে অনেক জন্তুই ভয় করে। এইজন্যে সিংহকে পশুরাজ বলে।

তিমি : তিমি সমুদ্রে বাস করে। স্থলচর জন্তুদের মধ্যে হাতি সবচেয়ে বড়। আর স্থলচর বা জলচর সব জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে তিমিই সবচেয়ে বড়। কলকাতার যাদুঘরে গেলে দেখবে ৮৪ ফুট লম্বা এক বিরাট্ তিমির চোয়ালের দুটো হাড় একটা দরজার দুপাশে রয়েছে। ছোট ছোট গুগলি জাতীয় প্রাণী থেকে সমুদ্রের বড় মাছও তিমির খাদ্য। তিমি জলে থাকে বলে এর দেহের গঠন মাছের মতো; সেইজন্যে একে তিমিমাছ বলে। আসলে তিমি বিরাট্ চেহারার জন্তু। তাদের বাচ্চারা

স্তন্যপায়ী বা মায়ের দুধ খায়। এদের শরীরে অনেক চর্বি থাকে। এই চর্বি যোগাড় করার জন্যে মানুষ তিমি শিকার করে।



তিমি

বানর, গরিলা, শিম্পাঞ্জি : বনে জঙ্গলে নানারকমের বানর বা বাঁদর আছে। গরিলা বা শিম্পাঞ্জিদের বুদ্ধি আর গায়ের জোর বাঁদরদের চেয়ে অনেক বেশী। এদের লেজ নেই। হাত, পা আর মুখের গঠনে মানুষের সঙ্গে এদের যথেষ্ট মিল রয়েছে। এইজন্যে এদের বনমানুষও বলে। তোমরা পশুশালায় গেলে শিম্পাঞ্জি কতরকমের খেলা দেখাচ্ছে দেখতে পাবে। এদের শরীর কালচে লোমে ঢাকা। শিম্পাঞ্জি দু-পায়ে আর দু-হাতের গোটানো আঙুলের ওপর ভর



বানর

দিয়ে চলে; মাঝে মাঝে দু-পায়েও কিছুদূর যেতে পারে। বুদ্ধিতে মানুষের পরই শিম্পাঞ্জির স্থান।



শিম্পাঞ্জি (পুরুষ)

মানুষ : মানুষের চেহারা হাতি বা গণ্ডারের মতো বড় নয়, বাঘ বা সিংহের মতো নখ বা দাঁত নেই, হরিণের মতো জোরে ছুটতে পারে না কিন্তু বুদ্ধিতে এইসব প্রাণীদের অনেক উঁচুতে। তাছাড়া শরীরের গঠনের দিক্ দিয়েও অন্য সব প্রাণীদের থেকে অন্যরকম। খুব জোরাল জন্তুরাও চার পায়ে ঘোরাফেরা করে কিন্তু মানুষ দু-পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা চলাফেরা করতে পারে। এর ফলে মানুষের দুই হাতই কাজের জন্যে খোলা থাকে। দেহের তুলনায় মানুষের মস্তিষ্ক বা মগজ বেশী থাকার জন্যে বুদ্ধিও অনেক বেশী; আর অনেক বেশী চিন্তা

করবার ক্ষমতাও রাখে। ফলে মানুষ পৃথিবীর সবথেকে উঁচুদরের প্রাণী। মানুষই প্রকৃতিকে জয় করার চেষ্টা করে চলেছে আর অনেকটা সফলও হয়েছে।

উত্তর লেখ

১। কোন্ কোন্ জীবজন্তু গাছ-পালা, ঘাস খেয়ে আর কোন্‌গুলো মাংস খেয়ে বেঁচে থাকে। এই দু-রকমের জন্তুদের চেহারার আর স্বভাবের কি তফাত? এদের মধ্যে কারা মানুষের উপকার বা অপকার করে?

২। জন্তু-জানোয়ারদের মধ্যে কাদের একটু অদ্ভুত বলে মনে হয়? কোথায় এদের পাওয়া যায়?

৩। কাগজ কেটে আর রঙ দিয়ে নিচের লেখা জন্তুদের ছবি তৈরি কর আর এদের যে কোন দুটি জন্তু সম্বন্ধে যা জান লেখ—হাতি, গণ্ডার, জিরাফ, জলহস্তী আর ক্যাঙ্গারু।

৪। মানুষ অন্য সব জন্তুদের থেকে উঁচুতে কেন? মানুষের মতো দেখতে কি কি প্রাণী আছে?

৭

আমাদের দেহ

রেলগাড়ির ইঞ্জিন, মোটর গাড়ি, কাপড়ের কল, যন্ত্রপাতি তৈরি করার কারখানা, এদের ভেতরটা আর খুঁটিনাটি দেখলে অবাক্ লাগে। এসব চালাবার জন্যে কয়লা, তেল বা বিদ্যুৎ-শক্তির দরকার। কিন্তু এদের চেয়েও অবাক্ হয়ে যেতে হয় আমাদের দেহের ভেতরের কারখানা দেখলে বা জানলে। ভাত, রুটি, ডাল, মাছ, দুধ, শাকসবজি, ফল ইত্যাদি

খাওয়ার মানে হল শরীরের কারখানাকে ভালভাবে চালাবার যে-যে শক্তির দরকার সেগুলো এই সব খাবার খেয়ে হজম করলে তার থেকে আসবে। দেহের মধ্যে ঐ সব খাবার হজম হয়ে তাদের চেহারা বদলে যায়, আর ঐ খাবার থেকে অনেক জিনিস আমাদের দেহে শক্তি যোগায়, চলাফেরা করা বা অন্য কাজ করার ক্ষমতাও দেয়। হজম হবার পর খাবারের বাকী অংশগুলো আর দেহের অন্য কোন কাজে লাগে না, মল-মূত্রের আকারে বেরিয়ে যায়। মানুষের দেহের গঠন কি রকম গোলমেলে আর এই শরীরের ভেতর অনবরত যে কতরকমের কাজ চলছে তা জানলে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

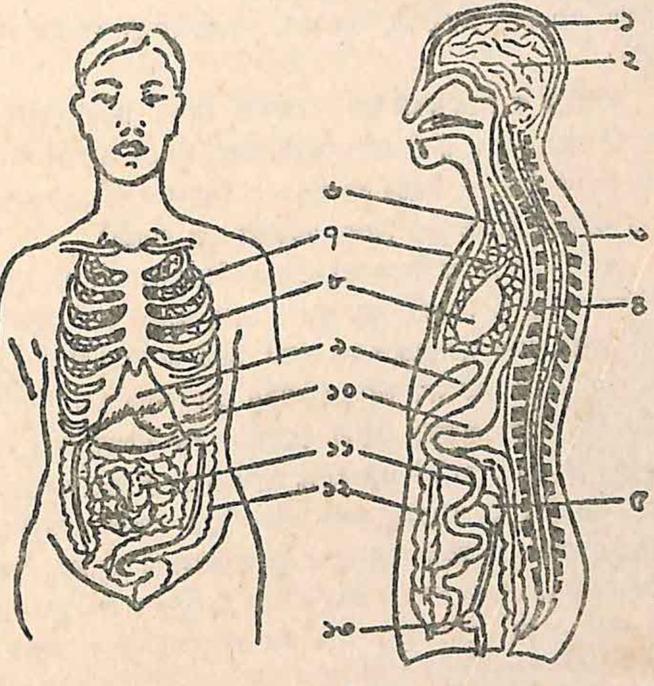


মানুষের দেহের কঙ্কাল

কঠিন বা শক্ত, **কোমল** অর্থাৎ নরম আর **তরল** বা জলের মতো এই তিনরকমের জিনিস নিয়ে মানুষের দেহ গড়ে উঠেছে। কঠিন অংশের মধ্যে রয়েছে—হাড়, দাঁত, আর নখ; কোমল অংশ—মাংস, শিরা, ধমনী, মস্তিষ্ক বা মগজ, ফুসফুস, পাকস্থলী ইত্যাদি; আর তরল অংশে রয়েছে রক্ত, রস ইত্যাদি।

কঙ্কাল—মাটি দিয়ে ঠাকুর বা পুতুল গড়া অনেকে দেখেছ। বাঁশ আর খড় দিয়ে প্রথমে কাঠামো তৈরি করে তার ওপর মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। আমাদের শরীরেও হাড়ের কাঠামো আছে তাকে বলা হয় **কঙ্কাল**। অন্য জন্তুদেরও কঙ্কাল আছে। এই হাড়ের কাঠামো বা কঙ্কালের ওপর আছে মাংস, শিরা, ধমনী আর তার ওপর আছে চামড়া। ২০৬টা হাড় নিয়ে মানুষের কঙ্কাল তৈরী হয়েছে। অনেকগুলো হাড় দড়ি-দড়ার মতো কতকগুলো জিনিস দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে জড়ান

আছে বলে এরা সহজে সরে যায় না। এইজন্যে মানুষ তার দেহ এদিক্‌ ওদিক্‌ বাঁকিয়ে সহজে চলাফেরা করতে পারে। কঙ্কালের প্রধান অংশ



মানবদেহের বিভিন্ন অংশ

১। মাথার খুলি ২। মস্তিষ্ক ৩। মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া ৪। অন্ননালী ৫। কিডনি ৬। শ্বাসনল ৭। ফুসফুস ৮। হৃৎপিণ্ড ৯। যকৃৎ ১০। পাকস্থলী ১১। ছোট অন্ত্র ১২। বড় অন্ত্র ১৩। মূত্রাশয়

মাথার খুলি, মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া, বুকের পাঁজর, হাত আর পায়ের দুজোড়া করে হাড়।

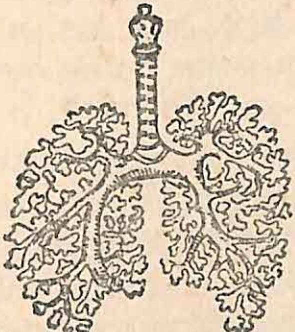
মাংসপেশী : দেহের ওপরের চামড়ার নিচে সাদা চর্বি আছে। চর্বির নিচে যে লালচে সরু আঁশ-যুক্ত অংশ তার নাম মাংসপেশী। শরীরের প্রায় অর্ধেক ওজনই এই পেশীর জন্যে। পেশীর সাহায্যেই আমরা ওঠা-বসা, চলা-ফেরা, কথা-বলা, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি করতে পারি।

পরিপাক বা হজম করার যন্ত্র : মেরুদণ্ড, বুকের পাঁজর, পাছার হাড় ইত্যাদি দিয়ে দেহের একটা খাঁচা তৈরী হয়েছে। এর ওপরের অংশকে বলে বক্ষ বা বুক আর নিচের অংশকে বলে উদর বা পেট। এই খাঁচাটার মধ্যে শরীরের কতকগুলো বিশেষ দরকারী যন্ত্র রয়েছে।

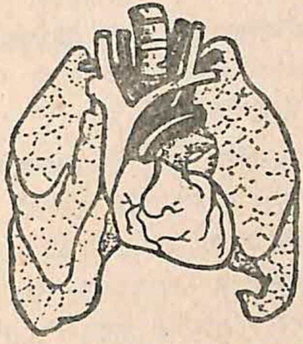
পেটের মধ্যে রয়েছে পাকস্থলী, তার ডানদিকে যকৃৎ বা কলিজা আর বাঁদিকে প্লীহা বা পিলে। পাকস্থলীর সঙ্গে রয়েছে ছোট অন্ত্র আর ছোট অন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বড় অন্ত্র। ছোট অন্ত্র বড় অন্ত্রটার চেয়ে সরু বলেই একে ছোট অন্ত্র বলা হয়, যদিও এটা লম্বায় প্রায় বিশ ফুট। নাড়িভুঁড়ি বলতে প্রধানত একেই বোঝায়। বড় অন্ত্রটা মোটা, তবে লম্বায় মাত্র পাঁচ ফুট। এটা মলদ্বারের সঙ্গে যুক্ত। আমরা খাবার খেলে সেটা অন্ননালী বা খাবারের নলের মধ্যে দিয়ে পাকস্থলীতে আসে। সেখানে আর ছোট অন্ত্রে নানা রসের সঙ্গে মিলে ঐ খাবারের কিছুটা অংশ হজম আর তরল হয়। ঐ রকম পাতলা অবস্থায় খাবার ছোট অন্ত্রের গা চুইয়ে রক্তের সঙ্গে মেশে আর রক্ত চলাচলের ফলে দেহের সব জায়গাতেই ছড়িয়ে পড়ে।

রক্তচলাচলের যন্ত্র : এর প্রধান অংশ হল হৃৎপিণ্ড আর রক্ত চলাচলের সরু নালীগুলো; এদের নাম শিরা আর ধমনী। এদের মধ্যে রয়েছে রক্ত। হৃৎপিণ্ডটা মানুষের হাত মুঠো করলে যতবড় হয় প্রায় তত বড়। বুকের মধ্যে কোথায় এটা আছে ছবিতে ভাল করে দেখ। বুকের ওপর কান রাখলে এর ধক্ ধক্ শব্দ শোনা যায়। দুপাশের ফুসফুসের সঙ্গে এটা রক্তনালী দিয়ে যোগ করা আছে, আবার যে

প্রধান শিরা আর ধমনীর শাখা-প্রশাখা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে আছে, তারাও হৃৎপিণ্ডের সঙ্গে যুক্ত। দেহের সব জায়গায় রক্ত চলাচল করার জন্যে হৃৎপিণ্ড একটা পাম্পের মতো কাজ করে। যারা মাংস বিক্রি করে তাদের দোকান থেকে ছাগলের ফুস্ফুসের সঙ্গে একটা হৃৎপিণ্ড কিনে এনে পরীক্ষা করলে ফুসফুসের সঙ্গে কিভাবে এটা জোড়া আছে দেখতে পাবে। হৃৎপিণ্ডটা লম্বালম্বিভাবে কাটলে তার মধ্যে ডান দিকে আর বাঁদিকে কুঠরি দেখতে পাবে।



ফুসফুস



হৃৎপিণ্ড ও দুই পাশে ফুসফুস

রক্তচলাচল হলে শরীরের সব জায়গায় যেমন খাবারের যোগান যায় সেইরকম শরীরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে দূষিত জিনিসগুলো শরীর থেকে বের হয়েও যায়। এইরকম দূষিত রক্ত সমস্ত দেহ থেকে শিরার মধ্যে দিয়ে এসে হৃৎপিণ্ডের ডান দিকের কুঠরিতে আসে। ঐ রক্তের রঙ কালচে। হৃৎপিণ্ড ঐ রক্ত পাম্প করে ফুসফুসে পাঠিয়ে দেয়, সেখানে রক্ত শোধিত বা পরিষ্কার হয়ে হৃৎপিণ্ডের বাঁদিকের কুঠরিতে ঢোকে। পরে ঐ পরিষ্কার রক্ত আবার পাম্প করে ধমনীর ভেতর দিয়ে শরীরের

সব জায়গায় চলে যায়। এইভাবে রক্ত পরিষ্কার করা আর তার সরবরাহের কাজ অনবরত চলছে।

শ্বাসযন্ত্র : এর বিভিন্ন অংশের নাম নাসাপথ, শ্বাসনল আর ফুসফুস। নাক দিয়ে আমরা বাইরের যে পরিষ্কার হাওয়া টেনে নিই, সেটা অনেক ছোট ছোট নলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে শেষ অবধি ফুসফুসের সব জায়গায় পৌঁছোয়। হৃৎপিণ্ড যে খারাপ রক্ত ফুসফুসে পাঠায় তার থেকে খারাপ অংশ বের হয়ে যায় আর বাইরের ভাল হাওয়া থেকে দরকারী অংশ নিয়ে ঐ রক্ত আবার শোধিত বা পরিষ্কার হয়। এই পরিষ্কার লাল রঙের রক্ত শরীরের সব জায়গায় যাবার জন্যে প্রথমে হৃৎপিণ্ডে যায়; আর রক্তের খারাপ অংশ আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে।

দূষিত পদার্থ নির্গমনের যন্ত্র : ফুসফুস দিয়ে রক্তের দূষিত বা খারাপ জিনিসগুলো খানিকটা গ্যাসের আকারে বেরিয়ে যায়। এছাড়া কিড্‌নি বলে যন্ত্র দুটো রক্ত থেকে আরও দূষিত জিনিস আর দরকারের বেশী জল আলাদা করে দেয়। এইগুলোই মূত্র বা প্রস্রাবরূপে বেরিয়ে আসে। চামড়ার ভেতর দিয়েও ঘামের সঙ্গে শরীরের অনেক দূষিত জিনিস বের হয়। বড় অন্ত্র থেকে মল বা পায়খানা হয়ে খাবারের অসার অংশ আর নানারকমের দূষিত পদার্থ বের হয়।

নার্ভতন্ত্র : এর অন্তর্গত মস্তিষ্কই শরীরের কর্তা। এটাই মানুষের বুদ্ধি, বিবেচনা ইত্যাদির কেন্দ্র। মস্তিষ্ক মাথার শক্ত খুলির মধ্যে সুরক্ষিত। এর তলা থেকে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে দড়ির মতো একটা জিনিস নেমে এসেছে, আর সেটা থেকে সুতোর মতো অনেক নার্ভ দেহের চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মস্তিষ্ক এদের মধ্যে দিয়েই দেহের নানা জায়গায় কাজ চালায়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় : চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা আর ত্বক্‌ বা চোখ, কান,

নাক, জিভ আর গায়ের চামড়া, এই পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা নানারকমের বাইরের জগতের জ্ঞানলাভ করি।

উত্তর লেখ

১। মানুষের দেহে কি কি যন্ত্র আছে বল।

২। মানুষের দেহ গড়ে ওঠার সময় কঙ্কাল আর মাংসপেশীর বিশেষ কাজ বুঝিয়ে বল।

৩। পরিপাকযন্ত্রের কাজ একটা ছবি এঁকে দেখাও।

৪। বাজার থেকে ছাগলের বা ভেড়ার হৃৎপিণ্ড যোগাড় করে পরীক্ষা কর। মানুষের দেহে রক্তচলাচল কিভাবে হয় লেখ।

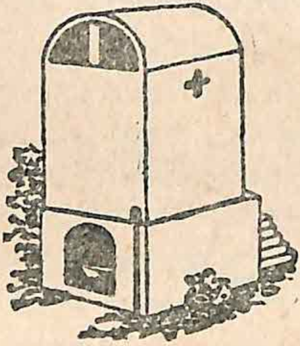
৫। নার্ভতন্ত্র কিভাবে সমস্ত দেহের কাজ ঠিকমতো চালাচ্ছে লেখ।

৮

মলমূত্র দূর করার সুব্যবস্থা

মলমূত্র বা পায়খানা আর প্রস্রাব দূর করার সুব্যবস্থার ওপর বাড়ির, আশেপাশের সকলের, গ্রামের বা পাড়ার স্বাস্থ্য খুব বেশী নির্ভর করে। মলমূত্রের মধ্যে খাবারের অসার ভাগ আর জলীয় অংশ বেশী থাকে। তাছাড়া শরীরের অনেক দূষিত জিনিসও মলমূত্রের সঙ্গে বের হয়। কলেরা, আমাশা, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগে যে সব লোককে ধরেছে তাদের মল থেকেও ঐসব রোগ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া মলমূত্র পচেও চারদিকের হাওয়া দূষিত করে।

ড্রেন-পায়খানা : কলকাতা, কল্যাণী ইত্যাদি শহরে ড্রেন-পায়খানার বন্দোবস্ত আছে। রাস্তার নিচে মোটা মোটা পাইপ চলে গেছে; তার সঙ্গে ছোট পাইপের সাহায্যে সব বাড়ির পায়খানার যোগ আছে। পায়খানায় মলমূত্র ত্যাগ করলে সেসব নিচের বড় পাইপে চলে যায়। সেখান থেকে জলের ধারার সাহায্যে শহরের বাইরে দূরে নিয়ে যাওয়া হয়। কল্যাণী শহরে এই ময়লা থেকে জল এমনভাবে আলাদা করা হয় যে সেই জল খুবই পরিষ্কার হয়ে যায়—কোন দূষিত জিনিস তাতে থাকে না। ময়লাও সারের কাজে লাগানো যায়। ময়লা দূর করার এর থেকে ভাল ব্যবস্থা আর নেই।


খাটা-পায়খানা


কুয়ো-পায়খানা

খাটা-পায়খানা : ছোট ছোট শহরে এই ধরনের পায়খানা আছে। পায়খানার নিচে বড় বালতি বা গামলার মধ্যে মল জমা হয়। মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌর-প্রতিষ্ঠানের মেথর এসে ঐ মল গাড়িতে তুলে শহরের বাইরে এক জায়গায় ফেলে। সেখানে ঐ মল সারে পরিণত হয় এমন বন্দোবস্ত করা আছে।

পাড়াগাঁয়ে অনেক লোকেরই পায়খানা নেই, সেজন্য গাঁয়ের লোকেরা মাঠে-ঘাটে মলমূত্র ত্যাগ করে। পাড়াগাঁয়ে বা ছোট শহরে মলমূত্র দূর করার ব্যবস্থা এইভাবে করা যেতে পারে—

গর্ত-পায়খানা : বাড়িঘর, কুয়ো, পুকুর ইত্যাদি থেকে দূরে যেখানে বর্ষার জল ওঠে না এরকম জমিতে একটা গর্ত খুঁড়ে সেটা পায়খানা



মলশোধক পায়খানা

১। পায়খানা ২। সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্ক ৩। ঝামার টুকরো

হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গর্তটা আধহাত চওড়া, একহাত গভীর আর চারহাত লম্বা করে কাটতে হয়। এর চারদিকে বেড়া আর ওপরে চালা বাঁধতে হবে, যেন বৃষ্টির জল ঐ গর্তের মধ্যে না পড়ে বা লোকের মাথায়ও না পড়ে। গর্ত খুঁড়ে যে মাটি উঠবে সেটা চালার নিচেই একপাশে থাকবে। প্রত্যেকের মলত্যাগের পর কিছু মাটি মলের

ওপর ছড়িয়ে দিতে হবে। কিছুকাল ব্যবহারের পর গর্তটা ভরে গেলে আর একটা গর্ত খুঁড়ে সেখানে ওপরের চালা সরিয়ে নেওয়া যায়।

কুয়ো-পায়খানা : এই পায়খানার জন্যে প্রায় একহাত চওড়া আর দশ-বার হাত গভীর একটা কুয়ো খুঁড়তে হবে। তার ওপর চালা, পাটাতন আর পাদান তৈরি করে নিতে হবে। পাড়াগাঁয়ে এই পায়খানা সাধারণত কিভাবে হয় দেখ। বৃষ্টির জল ইত্যাদি গড়িয়ে কুয়ো নষ্ট হতে পারে, এইজন্যে গর্তের চারদিকে ইট, পাথর আর মাটি দিয়ে গেঁথে পাটাতন পর্যন্ত তুলে নিলে বৃষ্টির জল, খড়কুটো ইত্যাদি গর্তের মধ্যে পড়তে পারে না, আর মশা, মাছিও এর ভেতর জন্মাতে পারে না।

মলশোধক পায়খানা : পাকা পায়খানার সঙ্গে একটা মলশোধক কুঠরি (সেপ্‌টিক্ ট্যাঙ্ক) যোগ করে দিলে মল প্রায় নির্দোষভাবে দূর করা যেতে পারে। মলশোধক কুঠরিটা মাটির নিচে ইটের তৈরী একটা সিন্দুকের মতো। আলো-বাতাস নেই এমন এই কুঠরিতে একরকমের কীটাণু পায়খানার মলকে তরল জিনিসে বদলে দিতে থাকে। পরে ঐ তরল জিনিস বাইরে গিয়ে ঝামার টুকরোর ভেতর দিয়ে চুইয়ে হাওয়ার সংস্পর্শে আসে আর প্রায় নির্দোষ হয়ে যায়।

উত্তর লেখ

১। পাড়াগাঁয়ে কিভাবে সহজে ভাল পায়খানার বন্দোবস্ত করা যায়?

২। খাটা-পায়খানার অসুবিধা কি কি?

৩। মলশোধক-পায়খানা কেন সবচেয়ে ভাল? একটা ছবি এঁকে এর কাজ বুঝিয়ে দাও।

৯

প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি আর প্রচারপত্র

প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি : কোন কাজ একা না করে কয়েকজন মিলে করলে কাজটা অনেক সহজে, অল্প সময়ে করা যায় আর যথেষ্ট আনন্দ আর উৎসাহও পাওয়া যায়। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের বিষয় শুধু বই পড়ে শেখা যায় না। গাছপালা, জীবজন্তু, আবহাওয়া ইত্যাদি হাতে কলমে শিখলেই তবে ঠিক জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু একার পক্ষে সব বিষয় দেখা সব সময় সম্ভব নয়। এইজন্যেই একটা প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি গড়ে তোলা দরকার। এই সমিতির সভ্যদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে এক এক দলকে এক একটি বিষয়ে দেখাশোনার ভার দিতে হয়, যেমন :

(১) গাছের পাতা, ফুল, ফল সংগ্রহ, (২) কি কি গাছ জন্মায়, (৩) গাছের জন্যে সার যোগাড় করা, (৪) গাছপালায় জল দেওয়া আর পোকা-মাকড় দূর করা, (৫) পোকা-মাকড় লক্ষ্য আর সংগ্রহ করা, (৬) পাখি দেখা, চেনা, পালক, বাসা, ডিম ইত্যাদি সংগ্রহ করা, (৭) আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ আর আবহাওয়ার ছবি আঁকা।

এক সপ্তাহ বা দু-সপ্তাহ অন্তর সমস্ত সভ্যেরা মিলে নিজেদের পর্যবেক্ষণ আর সংগ্রহের বিষয় আলোচনা করবে, ছবি আঁকবে, প্রবন্ধ লিখবে আর কোন্ কোন্ জিনিস কিভাবে স্কুলের সংগ্রহ-শালায় রাখবে তা ঠিক করবে। দু-এক মাস পর পর সমিতির একখানা করে হাতে লেখা পত্রিকা বার করতে পারলে এইসব কাজের দাম অনেক বেড়ে যাবে। স্কুল থেকে এসব কাজে নিশ্চয়ই সকলে সাহায্য করবেন।

প্রচার-পত্র : মাঝে মাঝে সমিতির সভ্য হিসাবে গ্রামের চাষীদের সঙ্গে এসব বিষয়ে কথাবার্তা বললে তোমরা আর তারাও অনেক কিছু জানতে

পারবে। আবহাওয়ার যে-যে ছবি তোমরা তৈরি করবে সে-সব শুধু চাষীদের নয়, গ্রামের অন্য লোকেদেরও দেখাবার বন্দোবস্ত করবে। খবরের কাগজে বা রেডিওতে আবহাওয়ার যে-সব খবর চাষের কাজে লাগবে তাও চাষীদের জানানো দরকার। এছাড়া ফল-ফসলের দাম, চাষ-বাস আর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে খবর, দেশ-বিদেশের বিশেষ বিশেষ খবরও, গ্রামে যারা এসব খবর পায় না বা লেখাপড়া জানে না, তাদের জানাবে। সবজি-চাষীদের কাছে গিয়ে সবজি চাষ সম্বন্ধে অনেক জিনিস জানতে পারা যায়। সেগুলো জেনে স্কুলের বা নিজেদের জমিতে শাক-সবজি ভালভাবে জন্মানো অনেক সহজ হয়ে যাবে। দেখবে তারা কত জিনিস জানে। তোমরাও কৃষি-বিভাগ থেকে অনেক খবর তাদের জানাতে পার; তাতে তাদেরও উপকার হবে।

উত্তর লেখ

১। তোমাদের ক্লাসে বা পাড়ায় কিভাবে প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি গড়ে তুলবে? প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতি গড়তে গিয়ে কি কি অসুবিধে হয়েছে?

২। প্রকৃতি-বিজ্ঞান সমিতির প্রচার-পত্রের একটা খসড়া তৈরি কর।

৩। বৈশাখ আর কার্তিক মাসে কৃষক-সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যে দুটি চিত্রিত প্রচার-পত্র কিভাবে তৈরি করবে তার খসড়া কর।

सत्यमेव जयते

No. 058446 /73-P.P.II.